প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত

এম.এ., পি-এইচ.ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৮

Rs. 7/8.

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর

পরম শ্রদ্ধেয় প্রফেসর

শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল.,

ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল মহোদয়ের

করকমলে

সূচীপত্র

বাঙ্গালা প্রবন্ধ

ইংরাজী প্রবন্ধ

---

* এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" (কার্ত্তিক ও মাঘ ১৩৪০) প্রকাশিত গ্রন্থকার লিখিত "বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধি-পত্র

বাঙ্গালা

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হইবে
৮	১২	কোচিন	কাচীন
১০	৮	এক	এবং
২৩	২২	ালুপা	কালুপা
৬০	১৬	শশাঙ্ক	ভাস্করবর্ম্মন
৮৯	৪	জোয়াদী	জোয়ানী
৯৩	৭	গজদণ্ডের	গজদন্তের

ইংরাজী

Page	*Line*	*For*	*Read*
39	16	Bengalee	Bengalees
41	29	crores	*Crosas*
45	29	Holdar's	Holkar's

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

ভূমিকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতরে বাঙ্গালার পুরাতন সংস্কৃতি ও ভাবধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৭ম হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বার শত বৎসরের এই সাহিত্য কোনক্রমেই অবহেলার যোগ্য নহে। ইহার অন্তর্গত ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছয়শত বৎসরের সাহিত্যকে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য বলা যাইতে পারে। এই মধ্যযুগ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ এবং নানাদিক দিয়া ইহার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালার জাতীয় জীবন ও ভাবধারার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে স্বাভাবিক সংযোগ রহিয়াছে সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে মধ্যযুগের সাহিত্যের উদ্ভব, পরিপুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সমগ্রভাগই কাব্য-সাহিত্য। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্য বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্বজ্জন-সমাজে যেরূপ অনাদর ও উপেক্ষা পাইয়া আসিয়াছে তাহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুধীসমাজ সর্ব্বপ্রথম মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী মহোদয়গণ তাহাদের স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন। ইহার ফলে ক্রমশঃ বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হইতে লাগিল এবং বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শন ও আলোচনার উপাদানস্বরূপ এই সমস্ত

পুথি সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালার পল্লীঅঞ্চলে কীটদষ্ট অবস্থায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছিল। এখন শিক্ষিত সমাজে এই পুথিগুলির যে সমাদর হইয়াছে তাহা দেশের পক্ষে আশার কথা।

এই সব পুথি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্যই প্রাচীন বাঙ্গালার একমাত্র সম্পদ নহে। অনুসন্ধানের ফলে এমন অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে যাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও সাহিত্যিক নানা গুণে সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নাথপন্থী-সাহিত্য, নানারূপ গীতিকা এবং ছড়া প্রভৃতিও রহিয়াছে।

আদি ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্গীত ও কাব্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। গদ্যের স্থান ইহাতে অতি অল্প। সাহিত্যিক অঙ্গের মধ্যে নাটকের স্থান প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একেবারেই নাই। প্রাচীন সাহিত্যে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব এই উভয় প্রকার সাহিত্যেরই নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এই উভয় প্রকার সাহিত্যের দিকেই আধুনিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। গীতধর্ম্মী (Lyric) বৈষ্ণব পদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলি তদানিন্তন "বৈষ্ণব-সাহিত্য" ও সমাজের যে অপূর্ব্ব আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। অপরপক্ষে "লৌকিক-সাহিত্য" নামে পরিচিত শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যগুলি কতকটা মহাকাব্যধর্ম্মী (Epic) ও বিশেষভাবে বস্তুধর্ম্মী (Realistic)। ইহাতে আদর্শবাদ (Idealism) থাকিলেও বস্তুধর্ম্মই অধিক পরিমাণে

রহিয়াছে। "অনুবাদ-সাহিত্য" নামে পরিচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের নিছক অনুবাদ নহে। এই গ্রন্থগুলি মহাকাব্যধর্ম্মী এবং বিভিন্ন কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়ভাবে পরিপূর্ণ। আর পল্লী-সাহিত্যগুলি বাঙ্গালার পল্লীজননীর সন্তানগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা বর্ণনার অফুরন্ত নির্ঝর। প্রাচীন বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে হইলে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ন্যায় অবৈষ্ণব বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিতও নিবিড় পরিচয় অপরিহার্য্য।)

(প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে নানারূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ৭ম হইতে ১২শ শতাব্দী (মুসলমান-বিজয়) পর্য্যন্ত আদিযুগ বা প্রকৃত প্রাচীন যুগ, ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী (পলাশীর যুদ্ধ) পর্য্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৯শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আধুনিক যুগ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ মধ্যযুগের সাহিত্য পুনরায় ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দী (শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়) পর্য্যন্ত প্রথম যুগ ও ১৬শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী (শ্রীচৈতন্যের ও তৎপরবর্ত্তী কাল) পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ কল্পিত হইয়া থাকে। (মোটামুটি ১৪শ শতাব্দীতে মধ্যযুগের সাহিত্যের আদিপ্রচেষ্টা, ১৫শ—১৬শ শতাব্দীদ্বয়ে ইহার পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি ও ১৭শ--১৮শ শতাব্দীদ্বয়ে ইহার ক্রমিক অবনতি সূচিত হইয়া থাকে। সময়ের দিক দিয়া ছাড়া অন্য নানা ভাবেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিভক্ত করা চলে। তন্মধ্যে ধনীলোকপুষ্ট সাহিত্য (মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য), গ্রাম্যলোকসমর্থিত সাহিত্য (গ্রাম্যগীতিকা ও ছড়া প্রভৃতি) এবং শিক্ষিতলোকপুষ্ট সাহিত্য (বৈষ্ণব সাহিত্য) —এই তিনপ্রকার সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

আবার বাঙ্গালার সমতলভূমির অধিবাসীদিগের পল্লীসাহিত্য (মঙ্গলকাব্যাদি) ও নাগরিক-সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি) এবং পশুচারণ ভূমির অধিবাসীদিগের সাহিত্য (বৈষ্ণবগীতি-সাহিত্য) হিসাবে তিনটী ধারাও বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। ধর্ম্মবিষয়ক যে সব গ্রন্থ রহিয়াছে তন্মধ্যে প্রধানতঃ লৌকিক দেবতা অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্যাদি এবং পৌরাণিক দেবতা অবলম্বনে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণব গীতিসাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া সংস্কৃত পুরাণাদি সাহিত্যের প্রভাবে রচিত ও অনূদিত "অনুবাদ-সাহিত্য" (রামায়ণ, মহাভরত ও ভাগবত), লৌকিক দেবতার প্রভাবসমন্বিত ও মূলতঃ সংস্কৃত প্রভাববর্জ্জিত "লৌকিক-সাহিত্য" (মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন) এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আংশিক প্রভাববিশিষ্ট ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী "বৈষ্ণবসাহিত্য" (গীতি ও জীবনচরিত সমূহ)—এই তিন প্রকার সাহিত্যেরও শ্রেণী বা typeএর সন্ধান পাওয়া যায়। এতদুপরি গ্রাম্য-গীতিকা ও ছড়া প্রভৃতিতো রহিয়াছেই। সাধারণতঃ অন্য একরূপ বিভাগও পরিকল্পিত হয়—ইহা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সাহিত্য। অবৈষ্ণব সাহিত্যকে কতকটা শাক্ত ও তান্ত্রিক সাহিত্যও বলা চলে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগ খুব পুরাতন না হইলেও আনুমানিক ৭ম-৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যুগের সময় ধার্য্য করা যাইতে পারে। এই যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ প্রাকৃত বহুল কতিপয় ছড়া ও গানের সমষ্টি মাত্র এবং অনেক পরিমাণে অলিখিত অর্থাৎ মুখে মুখে রচিত। ইহার পর ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর সাহিত্য লিখিত আকারে দেখা দিলেও যে পুথিগুলি পাওয়া যায় তাহাও প্রায় ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে। প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিতেই

বহু কবি ও গায়কের হস্তচিহ্ন দেখা গিয়া থাকে। এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মধ্য যুগের সাহিত্যের আমরা যে একটি সম্পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অবহেলার যোগ্য নহে। এই যুগের সাহিত্যের, বিশেষতঃ লৌকিক সাহিত্যের, মূলে ধর্ম্ম বিষয়কেই বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি ও মনের উচ্ছ্বাসই ক্রমশঃ সাহিত্যিক রূপ প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এবং বিশেষ করিয়া মধ্য-যুগের সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে, যে পটভূমিকার উপর এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই পটভূমিকায় তিনটি প্রধান বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—উহা ধর্ম্ম, জাতি ও দেশ। এতদ্ভিন্ন ইহাতে দেবতার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি ও নানা সাহিত্যগত আনুষঙ্গিক বিষয়ও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রধান তিনটি বিষয় সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট মত পোষণ করিতে না পারিলে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী সুনিয়ন্ত্রিত হইবার আশা নাই। অন্ততঃ এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে, বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের বিশাল বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত রূপটি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু নিম্নে বিষয়গুলি নিয়া কিছুটা আলোচনা করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম—প্রাচীন বাঙ্গালা বহুধর্ম্মের ও মতবাদের আকর-স্বরূপ। বহুদিন হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পাশাপাশি থাকিয়া উভয় ধর্ম্মের ভিতরে এক অপূর্ব্ব সার্ব্বজনীনতা ও ও সমন্বয় আনিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে এই দুই ধর্ম্মেরই লক্ষণাক্রান্ত নাথধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-পূজার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

এই দুই ধর্ম্মের উপাসকগণ ব্যতীত চণ্ডী-দেবী ও মনসা-দেবীর উপাসক সম্প্রদায়ও সংখ্যায় অল্প ছিল না। এই সব লৌকিক ধর্ম্ম গোড়াতে সংস্কৃত পুরাণ হইতে আগত না হইয়া সাধারণ জনগণ হইতেই ইহাদের প্রথম উদ্ভব এবং ব্রতকথাগুলির ভিতর দিয়াই ইহাদের প্রথম বিকাশ হওয়া অসম্ভব নহে। (আদি মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের মূলের সহিত বাঙ্গলা ব্রতকথা সমূহের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং চণ্ডীমঙ্গল-সাহিত্যই বিশেষভাবে এই ব্রতকথাগুলির সহিত জড়িত আছে।) মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের "মঙ্গল" কথাটি সম্বন্ধে এই স্থানে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। "মঙ্গল" শব্দটির সুস্পষ্ট অর্থ "শুভ"। এই হিসাবে গোড়াতে যে গান শুনিলে গায়ক, শ্রবণকারী এবং গৃহস্বামীর মঙ্গল হয় তাহাই "মঙ্গলগান"। এক শ্রেণীর বিশেষ গানকেই প্রথমে "মঙ্গলগান" বলিত। কালক্রমে ব্যাপকভাবে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার ব্যবহার হইতে লাগিল। ইহার ফলে একদিকে যেমন কতিপয় বৈষ্ণবগ্রন্থ "শুভ" অর্থবাচক "মঙ্গল" আখ্যাপ্রাপ্ত হইল তেমনই গঙ্গা দেবী, ষষ্ঠী দেবী, শীতলা দেবী, দক্ষিণরায় (বাঘের দেবতা) প্রভৃতির নামে রচিত গ্রাম্য ছড়াগুলিও "মঙ্গল" গানের পর্য্যায়ে পড়িল। এই প্রসঙ্গে একটি কাব্যের নাম (ছড়া নহে) করা যাইতে পারে—উহা "ধর্ম্ম-মঙ্গল"। বিভিন্ন নামে পরিচিত ও প্রায়শঃ শিলাখণ্ডে অথবা নানাচিহ্নে পূজিত এই গ্রাম্য ও পুরুষ-দেবতা শুধু রাঢ় দেশে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এ কালের কতিপয় নিম্নশ্রেণী (যথা হাড়ি ও ডোম) কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল যাবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণাদি বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এই দেবতা সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

এই সব গ্রাম্য অথবা পৌরাণিক দেবতার নামে রচিত

কাব্য অথবা ছড়া মাত্রই কি প্রকৃত মঙ্গলকাব্য? অবশ্য আমাদের ইহাতে সন্দেহ আছে। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈষ্ণব এই ত্রিবিধ বিভাগ সমীচীন কি? ইহাও আমরা সঙ্গত মনে করি না। প্রথমে এই সব প্রশ্নের আলোচনার পূর্ব্বে, "মঙ্গলকাব্য" কাহাকে বলে অর্থাৎ মঙ্গল-কাব্যের মূল লক্ষণ কি তাহাই দেখা বিশেষ প্রয়োজন। যে কাব্য কোন দেবতার স্তুতিগান হইতে সমুদ্ভূত তাহাকে "মঙ্গল-কাব্য" বলা যাইতে পারে। তবে ইহা সাধারণতঃ কোন স্ত্রী-দেবতার নামেই প্রথমে রচিত হইয়াছিল বলিয়া এই জাতীয় সাহিত্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্যই উল্লেখযোগ্য হওয়া উচিত। তাহার পর এই জাতীয় কাব্যরচনার একটি বিশেষ রীতি (Technique) লক্ষ্য করা যাইতে পারে, যথা—স্তবস্তুতি, কাঁচুলি-নির্ম্মাণ, চৌতিশা, কোন শাপভ্রষ্ট দেবতার ভক্তরূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হওয়া, উপাস্য দেবতার কোনও প্রসাদ, রন্ধনবিবরণ, বণিক সম্প্রদায় ও তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের বর্ণনা প্রভৃতি। মূলে ঐতিহাসিক অপেক্ষা অলৌকিক (Romantic) আবহাওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত ও কতকটা মহাকাব্যের (Epic) অনুকরণে রচিত কাব্যকেই মঙ্গলকাব্যের যথাযথ রূপ বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় কাব্যের করুণ (Pathos) ও হাস্যরসের (Humour) এবং বস্তুবাদ (Realism) ও আদর্শবাদের (Idealism) ভিতরে একটি বিশেষ ভাব ও ভঙ্গীর প্রকাশ রহিয়াছে যাহা উপেক্ষা করা যায় না। এই সব দিক দিয়া বিচার করিলে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলই আদর্শ এবং আদি "মঙ্গলকাব্য"। ধর্ম্মমঙ্গলকে আংশিকভাবে "মঙ্গলকাব্য" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে কোন পালবংশীয় রাজার

রাজত্বের বিবরণভাগ (Narrative) বিশিষ্টস্থান অধিকার করায় ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি ভক্তিমতী রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র ধর্ম্ম-ভক্ত লাউসেনের কাহিনী যতই মনোরমভাবে বর্ণিত হউক না কেন, ইহাতে যতটা কবিজনোচিত আতিশয্য ও বর্ণনার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে ততটা ভক্তির পরিচয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিগণের তুলিকাসম্পাতেও এই আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। আর একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। "ধর্ম্ম-মঙ্গল" নামটির বেশ প্রাচীনত্ব আছে। মৌর্য্যসম্রাট অশোক (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) তাঁহার একটি অনুশাসনের ভিতরে (Rock Inscription, Edict No. 9)* যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি স্ত্রীগণের প্রতিপাল্য ব্রতাদির ন্যায় বহুবিধ মঙ্গল কার্য্যের মধ্যে এই "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে ব্রতকথার সহিত পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যের দেবতার সংস্রবের পথও প্রশস্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য সম্রাট অশোকের উল্লিখিত ধর্ম্ম-মঙ্গল—"কার্য্য" এবং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত ধর্ম্ম-মঙ্গল—"কাব্য", সুতরাং উভয় ধর্ম্ম-মঙ্গলের অর্থও বিভিন্ন। তবু "মঙ্গল" কথাটির অর্থ এক রূপই আছে বলা যাইতে পারে। ইহার সাধারণ অর্থ "যে কার্য্য করিলে মঙ্গল হয়"। সম্রাট অশোক "ধর্ম্ম" কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা পিতামাতার শুশ্রূষা এবং গুরুজনগণের প্রতি বশ্যতা ও সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। এই সৎকার্য্য-গুলি অশোকের মতে "ধর্ম্ম" আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত রাঢ়দেশে পূজিত ধর্ম্মঠাকুর একটি "দেবতা" বিশেষ।

---

* Hultschz—Corpus Ins. Ind. Vol., and D. R. Bhandarkar—Asoke.

সম্রাট অশোকের ব্যবহৃত "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কথাটির সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের "ধর্ম্ম মঙ্গল" কথাটির বাহ্যিক ঐক্য আমাদিগকে বিস্মিত করে। ধর্ম্ম-মঙ্গলের ধর্ম্মদেবতা সংগুপ্ত বুদ্ধ এবং "বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ" নামক ত্রিরত্নের অন্যতম "ধর্ম্ম"ই ধর্ম্মদেবতারূপে রূপান্তরিত হইয়া রাঢ়দেশে ধর্ম্মঠাকুর নামে পূজিত হইতেছেন এইপ্রকার একটি মত চলিত আছে। এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাহিনীতে বর্ণিত রাণী রঞ্জাবতী যে সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্মপূজার কাহিনী ও রাজা হরিচন্দ্রের উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন তাহাদিগকে গাজনের শৈবসন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মঠাকুরের শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের বস্তুর প্রতি প্রীতি লক্ষণীয় বটে। শিব ঠাকুরেরও বর্ণ শ্বেত এবং গৌড়ে শৈবধর্ম্মের তৎকালীন প্রতিপত্তি গৌড়ের অধীন রাঢ়দেশকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। নানারূপ চিহ্নে পূজিত ধর্ম্মঠাকুর—লিঙ্গমূর্ত্তি শিব ঠাকুরকে রাঢ়ের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচারের প্রকারভেদ হইতেও পারে। "ধর্ম্ম" কথাটি বৌদ্ধগণ নিজস্ব করিয়া নিতে চেষ্টা করিলেও বাস্তবিক হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই কথাটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নানা অর্থে প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্ম-পূজা হাড়ি ও ডোমজাতিদ্বয় কেন বিশেষ করিয়া গ্রহণ করিল ইহাও এক প্রধান সমস্যা। ধর্ম্ম-ঠাকুর মূলে জাতি-বিরোধী শিবঠাকুর হইলে এই দেবতা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয় হওয়াই অধিক স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্মের প্রচার রাঢ়দেশের বাহিরে হইল না কেন তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য। রাঢ়দেশে প্রথমে স্মার্ত্তপণ্ডিত-

গণের প্রভাব ও পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব প্রভাব, হাড়ি ও ডোম জাতির রাঢ়ের বাহিরে বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র সংখ্যাল্পতা এবং বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থ এই অঞ্চলটি ক্রমাগত পশ্চিমাগত রাজনৈতিক গোলযোগের কেন্দ্রস্থল হওয়ার দরুণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পূজিত ধর্ম্মদেবতার রাঢ়দেশের বাহিরে পূজা প্রচলনের প্রয়োজন ও সামর্থ্যতো ছিলই না বরং স্বদেশেই ধর্ম্ম-পূজার প্রভাব কমিয়া আসিয়াছিল। সেনরাজগণ পাল-রাজগণের পরে বাঙ্গালাদেশে প্রভাবশালী হন। তাঁহারাও আদিতে শৈব ছিলেন ও শৈব উপাধিগ্রহণ করিতেন। সেন-রাজগণ শিবঠাকুরের ভক্ত হইলেও জাতিবিচারের দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই রাজগণ হাড়ি ও ডোম-পূজিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার কোন সমর্থন বা সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের চাপে পড়িয়া হাড়ি ও ডোমগণ জাতিবিচারহীন শিবঠাকুরের স্থানে পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মঠাকুররূপটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিনা দেখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্যগুলির ভিতরে বৈষ্ণব প্রভাবও কম পড়ে নাই। চৈতন্য পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় ধর্ম্মঠাকুরের স্তুতি করিতে যাইয়া ভক্ত বিষ্ণুভক্তি দেখাইতেছেন। ধর্ম্মঠাকুর বুদ্ধই হউন, শিব ঠাকুরই হউন, বিষ্ণু দেবতাই হউন, সূর্য্য ঠাকুরই হউন, অথবা স্বতন্ত্র কোন দেবতাই হউন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এই দেবতাকে একেবারে মানিতেন না এবং যাহা মানিতেন তাহাও ভয়ে ভয়ে মানিতেন এই সিদ্ধান্তটির ও আলোচনা আবশ্যক। এত সামাজিক ভীতির মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের "ধর্ম্ম-মঙ্গল" সাহিত্য নামে একেবারে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

"জাতি যায় যদি প্রভু করি ইহা গান" উক্তিটি কি ধর্ম্মঠাকুরের বুদ্ধত্বের অকাট্য প্রমাণ? ইহাতো নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের উপরে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের বিদ্বেষের ইঙ্গিতও হইতে পারে।

"ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্য বাদ দিলে ষষ্ঠী দেবী, গঙ্গা দেবী, শীতলা দেবী, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি দেব-দেবীর নামে যে সব ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহাদের কোন্‌টি আদিতে পৌরাণিক, কোন্‌টি বৌদ্ধ আর কোন্‌টি বা লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত ছড়া তাহা নিয়া মতভেদের অবকাশ আছে। কোন্ কোন্ জাতির (Races) মধ্যেই বা সেই সব দেবদেবীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল? ইহার বিচার করিবারও প্রয়োজন রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ আমরা উপরে বলিয়াছি সেই হিসাবে এই সব গানও প্রকৃত "মঙ্গলকাব্যের" অন্তর্গত নহে। যাহা হউক এইগুলিও নানা দেবদেবীর উপলক্ষে রচিত ছড়া বলিয়া এই সাদৃশ্যটুকু হইতে ইহাদিগকেও না হয় "মঙ্গলকাব্য" নামে অভিহিত করিলাম, কিন্তু বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলির মধ্যে কোন কোনটির "মঙ্গল" নাম (চৈতন্যমঙ্গল ও অদ্বৈতমঙ্গল) দেখিয়াই সেইগুলিকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা একেবারেই উচিত নহে। শাক্ত মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে অন্নদামঙ্গল কাব্যের কতিপয় বৈষম্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীনকালে এমন এক যুগ ছিল যখন কবিগণ তাহাদের রচিত কাব্যগুলিকে "পুরাণ" অথবা "মঙ্গল" নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন। তাহার ফলে এই দুইটি শব্দের তাঁহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে বোধ হয় "পুরাণ" কথাটি ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছিল। সেইজন্য পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল),

শূন্যপুরাণ ও হাকন্দপুরাণ (ধর্ম্মমঙ্গল), অনিলপুরাণ প্রভৃতি কাব্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অপরপক্ষে "মঙ্গল" কথাটি হয় দেশজ না হয় বৌদ্ধপ্রভাবই অধিক সূচিত করিতেছে। সংস্কৃতের অনুকরণে এই কথাটির ব্যবহারও অসম্ভব নহে। এই সব নানাদিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে কোন বাঙ্গালা কাব্যের নাম হিসাবে 'পুরাণ' কথাটি থাকিলেই তাহা প্রকৃত "পুরাণ" নহে এবং "মঙ্গল" কথাটি থাকিলেই তাহা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য নহে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় ধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে একটি ধর্ম্মের কথা আমাদের স্বতঃই মনে উদিত হয়, ইহা তান্ত্রিকধর্ম্ম। কি হিন্দু-বৌদ্ধগন্ধী নাথপন্থীদের সাহিত্যের অন্তর্গত মীনচেতন, গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান, কি শিবায়ন নামে পরিচিত শিবঠাকুরের উদ্দেশ্যে রচিত ছড়া, কি বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলকাব্য—সর্ব্বত্রই একটি ধর্ম্মের লক্ষণ সুস্পষ্ট—ইহা তান্ত্রিকতা। এই "তান্ত্রিকতা" কথাটির মোটা-মুটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত ধর্ম্ম এবং তাহারই পৌরাণিক রূপান্তর মাত্র। অথচ হিন্দুধর্ম্মের যে বেদবহির্ভূত "তন্ত্র" শাস্ত্র হইতে আগত আর একটি রূপ আছে তাহা আমরা কতকটা ভুলিয়া যাই। "বেদ" হইতে "তন্ত্র" অধিক পুরাতন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। বেদ ও তন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন কিনা তাহাও বলা কঠিন। মূলতঃ বেদ হইতেই তন্ত্র আগত কিনা তাহা নিয়াও মতভেদ থাকা সম্ভব। সময়ের দিক দিয়া বেদ আগে কি তন্ত্র আগে রচিত হইয়াছিল তাহা বলাও যেমন কঠিন, এই উভয় শাস্ত্রের সঠিক সময় নির্দ্দেশ করাও তেমন

দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক উপাস্যদেবতা, ধর্ম্মপ্রণালী ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বেদ ও তন্ত্র পৃথক পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কি অন্তর্নিহিত গুহ্য বিষয়সমূহ, কি ধর্ম্মসাধনার বাহ্যিক অঙ্গসমূহ, কোন দিক দিয়াই উভয় শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় না। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়াও বেদের সহিত তন্ত্রের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ-পরবর্ত্তী ষড়-দর্শনের অন্তর্গত কোন কোন দর্শনশাস্ত্র (যথা সাংখ্য ও যোগ-দর্শন) এই তন্ত্রশাস্ত্রের নিকটই মূলতঃ ঋণী না তন্ত্রশাস্ত্রই এইজন্য আদিতে বেদের নিকট ঋণী তাহা সঠিক নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে মতের সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা উভয়ই বিশেষ লক্ষণীয় সন্দেহ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে বৈদেশিক প্রভাব কতটা পড়িয়াছে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন। "বৈদেশিক" বলিতে প্রধানতঃ মঙ্গোলিয় ("তিব্বত-ব্রহ্মী") প্রভাবের কথাই এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় বেদ যজ্ঞের নির্দ্দেশ দেয়, আর তন্ত্র বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া কল্পিত দেবদেবীর ধ্যানের উপদেশ দেয়। বেদ দেহতত্ত্বের উপর তত জোর দেয় না, কিন্তু তন্ত্রের উহাই একটি প্রধান অবলম্বন। বেদ অমৃতের সন্ধান করে, অপর-পক্ষে তন্ত্র মৃত্যু আনয়নকারী দেবতা ও বিষসম্বন্ধে গবেষণার পথ নির্দ্দেশ করে। দেবতাসম্বন্ধে বেদের প্রধান এক দেবতা ব্রহ্ম ও তন্ত্রের যুগ্ম দেবতা পরমশিব ও শক্তি। "শব্দব্রহ্ম" সম্বন্ধে বেদ অবহিত থাকিলেও তন্ত্রের উহা প্রাণস্বরূপ। অক্ষর উচ্চারণ ও অক্ষরের ভিতরে দেবত্বের সন্ধানে তন্ত্র বেদ অপেক্ষা অধিকতর তৎপর মনে হয়। তন্ত্রে স্ত্রীদেবতা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে অথচ বেদে স্ত্রীদেবতা ততটা উচ্চ স্থান পায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে মনোযোগী হইয়া তন্ত্র

যোনি পূজার (পুং ও স্ত্রী উভয়ই) দিকে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে, অপরপক্ষে বেদে উহাও তেমন স্বীকৃত তো হয়ই নাই বরং নিন্দিত হইয়াছে। পশুবলি-প্রথা বেদ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রে স্বীকৃত হইলেও বেদ এবং তন্ত্রে এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা গুহ্যতত্ত্বে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তন্ত্রে আসন, ন্যাস, দীক্ষা ও গুরু সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ রহিয়াছে বেদে তাহা নাই। সাধনা, ধ্যান, জপ, বিভিন্ন প্রকারের সাধক, সাধকের বিভিন্ন ভাব ও অধিকার, সাধনার সাহায্যে দেহস্থ বায়ুর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে তন্ত্রে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্রের ধারণা ও নির্দ্দেশ বিশেষ অভিনব সন্দেহ নাই। মানুষকে তন্ত্র যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছে বেদ তাহা দেখে নাই। মানবদেহের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনায় ও মানবকে দীর্ঘজীবী করিবার প্রচেষ্টায় তন্ত্রের বিশেষ নূতনত্ব ও আগ্রহ দেখা যায়। তন্ত্রের এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে চিকিৎসা শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। বিষকে অমৃতে পরিণত করিতে ও মৃত্যুকে জয় করিয়া মানুষকে অমর করিতে তন্ত্রের অত্যধিক আগ্রহের ফলে এই দেশে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক পরিমাণে উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। শুধু দার্শনিক তত্ত্বের দিকেই নহে বিজ্ঞানের দিকেও তন্ত্রশাস্ত্রের যে অমূল্যদান রহিয়া গিয়াছে তাহার তুলনা নাই। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—সাধনার এই ত্রিবিধ পথের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র জ্ঞানকেই বিশেষরূপে বাছিয়া লইয়াছে। অপরপক্ষে বেদ কর্ম্মকাণ্ডের উপরেই বেশী নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিকতা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসাধনার

কতকগুলি স্বতন্ত্র নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র না একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মপদবাচ্য তাহা সঠিক বলা দুরূহ। বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুইটি মতই হিন্দুধর্ম্মের দুই অঙ্গ। কোন সময় উভয় ধর্ম্মের স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইলেও এখন এই উভয় ধর্ম্ম বৃহত্তর হিন্দুধর্ম্মের দুই শাখারূপে গণ্য হইতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে হিন্দুধর্ম্মকে গ্রহণ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মকে যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় এতদ্দেশীয় তান্ত্রিক ধর্ম্মকেও সেরূপ ভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা বলা যায় না। তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে গণ্য করিলে পৌরাণিক শাখার ন্যায় তান্ত্রিকতাও ধর্ম্ম পদবাচ্য হইয়া ইহার অন্যতম শাখারূপে গণ্য হইতে পারে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম—এই উভয় ধর্ম্মই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে লৌকিক ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্মগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুই ধর্ম্মের ভক্তগণ পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় বিবাদও যে না হইত তাহা নহে। রাজা শশাঙ্কের সময় (৭ম শতাব্দী) ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে এই দুই ধর্ম্মের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাব বিনিময় ও মিলনের সুরই বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই উভয় ধর্ম্মের (শৈব হিন্দুধর্ম্ম ও মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম) মিলনের অন্যতম ফল "নাথধর্ম্ম"। যে মতবাদ বা ধর্ম্মের সাহায্যে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এমন সুন্দরভাবে মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন উহাই "তান্ত্রিকধর্ম্ম"। ইহার ফলেই আমরা "হিন্দুতান্ত্রিক" ও বৌদ্ধতান্ত্রিক" সম্প্রদায় দুইটিকেও পাইতেছি।

হিন্দুতান্ত্রিকদিগের মধ্যে আবার শৈবতান্ত্রিক, শাক্ততান্ত্রিক ও বৈষ্ণবতান্ত্রিক নামক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাখাত্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দী বাঙ্গালার ধর্ম্মান্দোলনের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য শতাব্দী। এই শতাব্দীতে রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সমাজের অভ্যন্তরে নূতন নূতন ভাবধারা প্রবেশ লাভ করিয়া বাঙ্গালার জনগণের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে এই সময়ে শৈব শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ এই দেশে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে দার্শনিক ও মায়াবাদী হইতে সাহায্য করিয়াছিল। ইহার অনেক পরে (খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীতে) দাক্ষিণাত্যের অন্যতম বৈষ্ণব রামানুজের ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এই ভক্তিবাদ ক্রমে বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। আংশিকভাবে মায়াবাদ ও বিশেষভাবে ভক্তিবাদ বাঙ্গালীকে হয়তো শৌর্য্য-বীর্য্যহীন করিতেও সহায়তা করিয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর এই দুরবস্থায় উপনীত হইবার অপরাপর কারণও বর্ত্তমান ছিল। এই অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিকধর্ম্ম একবার সংস্কার করা হয়। "মহাচীন" (ইরাবতী নদীর পশ্চিমতীরস্থ কাচীন অথবা তাহার নিকটস্থ চীন দেশ ?) হইতে ঋষি বশিষ্ঠ "তারামন্ত্র" সংগ্রহ করিয়া এই দেশে আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তান্ত্রিক ধর্ম্মের এই সংস্কার কার্য্যে তিনি হয়তো সহায়তা করিয়া থাকিবেন। এই অষ্টম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষ হইতে চীন ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে এবং ইহার পরবর্ত্তী ২।৩ শতাব্দী মধ্যে চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তান্ত্রিকতা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে। এই বাঙ্গালাদেশ

হইতে অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বত-দেশে মহাযানী বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করিয়া তথায় বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক মতবাদ বিশেষভাবে গ্রহণ করে। ইহার ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে এবং তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্ম্ম (শাক্ত) কামরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রের দেবতা শিব। শিব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোতা। উভয়ের প্রশ্নোত্তর অবলম্বনে সংস্কৃত তন্ত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রগুলি সাধারণতঃ যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহা গুপ্ত যুগের (৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী) ভাষা বলা যাইতে পারে। অথচ তন্ত্র যদি এই সময় অপেক্ষা পুরাতন হইয়া থাকে তবে ভাষার ভিতরে তাহার নিদর্শন কোথায় ? তিব্বতে যে তদ্দেশীয় ভাষায় "কেঙ্গুর" ও "তেঙ্গুর গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার তান্ত্রিক বিষয়বস্তুগুলি ভারতবর্ষ হইতেই নেওয়া হইয়াছে। তাহা খৃঃ ৯ম৷১০ম শতাব্দীর, সুতরাং আরও পরের ব্যাপার।

অথচ তন্ত্র যে বহু পুরাতন কাল হইতে এই দেশে প্রচলিত আছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বৈদিক আর্য্য ও দ্রাবিড়দিগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে জাতি (সম্ভবতঃ অন্য শাখার ককেশীয় জাতি) পূর্ব্বভারতে এক সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, হিমালয় পর্ব্বতের সহিত তাহাদের বিশেষ সম্বন্ধ অনুমান করিবার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদেরই পূজিত (?) বৃষভারূঢ় শিবঠাকুরের চিত্র কি বৈদিক আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে মহেঞ্জোদরোতে খনিত বস্তুগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ? জাতিবিচারহীন শিবদেবতার গাত্রবর্ণ

শ্বেত, তাঁহার বাহন হিমালয়ের অধিবাসী ইয়াক্‌প্রাণী সদৃশ বৃষ এবং তাঁহার বিবাহ হয় হিমালয় অঞ্চলের কোন রাজকন্যার সহিত (উমাদেবী)। এই সব বিবরণ হইতে শিবদেবতাকে আদিতে কোন পার্ব্বত্য জাতির দেবতা বলিয়াই মনে হয়। যে বৈদিকআর্য্য-পূর্ব্ব ও দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির আদি দেবতা এই শিব তাহারাই পূর্ব্বভারত তথা প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাচীনতম ককেশীয় জাতীয় অধিবাসী বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এই শিব-দেবতাই তন্ত্রের প্রধান দেবতা। এই দিক দিয়া পূর্ব্ব-ভারতের বৈদিকআর্য্য-পূর্ব্ব পার্ব্বত্য (আলপাইন) পামিরিয়ান জাতিই এই দেশে তন্ত্রের প্রথম অথবা প্রধান আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে কিনা তাহার বিচার আবশ্যক।

মঙ্গোলিয় ও অষ্ট্রিক জাতিদ্বয়ের সংস্রবে আসিয়া এই পার্ব্বত্য (Alpine) জাতি স্ত্রীদেবতার পূজায় মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারে। পরে তন্ত্রশাস্ত্রের মতবাদ সম্বন্ধে নানা পরিবর্ত্তন আংশিকভাবে মঙ্গোলিয়জাতির সংস্রব হেতুও হইতে পারে। তবে Alpine গণের (Round-headed Pamirians) পূর্ব্বভারতীয় বংশধরগণই বোধ হয় তন্ত্রের ভাবধারা ক্রমশঃ পূর্ব্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। অবশ্য এই সব সিদ্ধান্তই অনুমান মাত্র এবং বিচারসাপেক্ষ।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়া কি পরিমাণ তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সঙ্গত। শুধু বৌদ্ধপ্রভাব ও হিন্দুপ্রভাব উল্লেখ করিলেই বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রকাশ বা প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় না।

জাতি—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব যেইরূপ সুস্পষ্ট জাতির প্রভাবও সেইরূপ উল্লেখযোগ্য। একটি সাহিত্য প্রথমে গড়িয়া উঠিতে জাতি ও ধর্ম্ম এই উভয়েরই প্রভাব তাহাতে থাকিবারই কথা। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বাহন মাত্র। জাতি ও ধর্ম্মবিশেষে, তথা নানাবিধ কারণে, সংস্কৃতিরও স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যাহা হউক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি কোন্ কোন্ জাতির সাহায্যে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। যে কোন দেশের সাহিত্যের আদি অবস্থা আলোচনা করিতে গেলেই সেই দেশের ধর্ম্মগত ও জাতিগত, এমন কি ভৌগোলিক নানা প্রশ্নের সমাধানও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

প্রাচীন বাঙ্গালার অধিবাসী বলিতে কোন্ কোন্ জাতিকে বুঝাইয়া থাকে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের প্রথম অধিবাসী হিসাবে বাঙ্গালা প্রদেশে "নেগ্রিটো" জাতি বসবাস করিত। অধুনা তাহারা একরূপ লোপ পাইয়াছে। ইহাদের পর এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে "অষ্ট্রিক"[১] নামক জাতি এই প্রদেশে প্রবেশ করে। তাহাদের পরে প্রাচীন ককেশীয় জাতির বিভিন্ন শাখা এই দেশে আগমন করে। ইহাদের আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের উত্তর-পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া

---

(১) Pre-Aryans & Pre-Dravidians in India (S. Levi).

নানা শাখায় বিভক্ত মঙ্গোলিয় জাতি দলে দলে এই দেশে প্রবেশ ও বসতি স্থাপন করে।

ভাষা ও সংস্কৃতিগত অর্থে আর্য্য, ইরাণীয়, তুরাণীয় প্রভৃতি শব্দ এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলেও ককেশীয় গোষ্ঠীর শাখাগুলিকে বুঝাইতে এখন অন্য নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রধান শাখাত্রয় অধুনা "উত্তরদেশীয়" (Nordic), "সামুদ্রিক" (Proto-Mediterranean) এবং "পার্ব্বত্য" (Alpine) এই নামে পরিচিত হইয়াছে। ককেশীয়গণের এই তিন শাখাই বিভিন্ন সময়ে ভারতে আগমন করিয়াছে। এই দেশের বৈদিক আর্য্যগণ "উত্তর-দেশীয়", দ্রাবিড়গণ "সামুদ্রিক" ও "তুরাণীয়" এবং পামিরিয়গণ "ব্রাত্য" ও "পার্ব্বত্য" সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে।[১]

শেষোক্ত জাতি সম্বন্ধে বলা যায় যে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়গণ ও বৈদিক আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্ব্বে ইহারা এই দেশে আগমন করিয়াছিল। মতান্তরে ইহারা দ্রাবিড়-পরবর্ত্তী জাতি। অতি প্রাচীনকালের এক বিস্মৃত যুগে উত্তরভারতে এক প্রবল ও সুসভ্য জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে Alpine (পার্ব্বত্য), Round-headed Pamirians (গোল-মস্তকসম্পন্ন পামিরিয় জাতি) বা Bracycephalic জাতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।[২] এই শেষোক্ত জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধারায় ভারতে প্রবেশের ফলে অন্যান্য জাতিগুলির

---

(১) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, সমাজ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ, গৌহাটী, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ সন।

(২) Indo-Aryan Races (R. Chanda).

সহিত নানা সময়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ক্রমে কতক দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম ভাগে এবং কতক উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে সরিয়া যাইতে এবং ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এই স্থানগুলি হইতে ইহারা আর স্থানচ্যুত তো হয়ই নাই বরং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে যে ইহারা একটি প্রবল জাতি বলিয়া কোন সময়ে গণ্য হইত তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতিই প্রাচীনকালে "ব্রাত্য"জাতি বলিয়া অভিহিত হইত বলিয়া কেহ কেহ মত পোষণ করেন। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের যে প্রবল জাতি "প্রাচ্য" (গ্রীক Prasii) নামে পরিচিত সেই জাতি মূলতঃ "Alpine" ও "ব্রাত্য" হওয়া অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ বাঙ্গালী জাতিকে মূলতঃ Mongolo-Dravidian বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ এই জাতিকে মূলতঃ Austro-Alpine বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমরা শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। পূর্ব্বভারতে বৈদিক আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে অষ্ট্রিকগণ ছাড়া পশ্চিমাগত যে সুসভ্যজাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহারা যে দ্রাবিড়-পূর্ব্বজাতি (Pre-Dravidian) তাহাও কোন কোন বিশেষজ্ঞ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া দেখিলে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে অষ্ট্রিক জাতি বাদ দিলে ইহাদিগকেই Alpine, প্রাচ্য বা Pamirian জাতি বলা যাইতে পারে। শিবঠাকুর বাঙ্গালাদেশে প্রাচ্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন দেবতা। হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলের সহিত এই দেবতার সংশ্রব হইতে যে আভাষ পাওয়া যায়

তাহাতে অনুমিত হয় ভারতের উত্তরস্থ পর্ব্বতাঞ্চলের শিবপূজক এক সভ্যজাতি বাঙ্গালায় কোন এক স্মরণাতীত যুগে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নসমূহ পাঠ করিলে এইরূপ অনুমানই প্রবল হইয়া উঠে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবীর এবং ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিবরণ বাঙ্গালার প্রাচীন ছড়া, ব্রতকথা ও কাব্যগুলিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে এই অনুমানই সুদৃঢ় হইয়া থাকে। যে প্রাচীন প্রাচ্যজাতির লুপ্ত ইতিহাস এই অতিরঞ্জনপূর্ণ লৌকিক এবং গ্রাম্যসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারাই বোধ হয় দ্রাবিড় ও বৈদিক আর্য্যগণের পূর্ব্বে আগত জাতি। পূর্ব্বভারতে ধর্ম্মহিসাবে সূর্য্যপূজার বিক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সূর্য্যপূজার আদি উপাসক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ (গ্রহবিপ্রগণ) ও শিব উপাসকগণ উভয়েরই আদি বাসস্থান মধ্যএসিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হওয়া বিচিত্র নহে। তবে বাঙ্গালাদেশে সূর্যাউপাসকরা শিবউপাসকগণের ন্যায় এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন দ্রাবিড়জাতির (Proto-Mediterraneans) প্রভাব বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমাংশে, একমাত্র রাঢ়দেশেই যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও আবার প্রধানতঃ দক্ষিণ-রাঢ়ে। সুতরাং বাঙ্গালাদেশে দ্রাবিড়জাতির প্রভাব খুব বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মনসাদেবীর আদিপূজক হিসাবে এবং বাঙ্গালাদেশে এই পূজার প্রবর্ত্তক হিসাবে দ্রাবিড়গণের দিকে অনেকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন। দ্রাবিড়গণ সমুদ্রপ্রিয় ও সর্প-উপাসক জাতি বলিয়া উক্তরূপ অনুমানের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই

মতের সহিত একমত হইতে পারি নাই। দ্রাবিড়গণ সমুদ্রপ্রিয়জাতি হইলেও প্রাচীনতর (Pre-Dravidian) অষ্ট্রিকগণও সামুদ্রিক এবং সর্পপূজক জাতি। দক্ষিণ-ভারত হইতে উত্তর-ভারতে তথা পূর্ব্ব-ভারতে দ্রাবিড়ী উপনিবেশের তেমন প্রসার দেখা যায় না। বরং দ্রাবিড়গণ একদিকে উত্তর-ভারত হইতে পার্ব্বত্য পামিরিয়ান বা প্রাচ্যজাতির এবং অপরদিকে বৈদিক আর্য্যজাতির ধাক্কা খাইয়া দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপরপক্ষে বহির্ভারতের অপর এক প্রবলজাতি আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার দিক হইতে জলপথ ও স্থলপথে ভারতে আগমন করিয়া যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি বৌদ্ধসাহিত্যে "নাগ" (সর্প) নামে বর্ণিত হইয়াছে এবং জল ও সমুদ্রের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত আছে। এই সব কারণে "নাগ" জাতিকে "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। উত্তর-ভারতে কুশান আধিপত্যের অবসানের পরে এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় দুই শতাব্দী কালব্যাপি (খৃঃ ২য়-৩য় শতাব্দী) উত্তর-ভারতের "দোয়াব" ভূভাগে এই জাতির সুপ্রতিষ্ঠ থাকিবার কথা অমূলক না হইবারই সম্ভাবনা; তবে উত্তর-ভারতে ইহাদের প্রথম আগমন যে অনেক পূর্ব্ব-যুগের ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নাগজাতি বৌদ্ধ সাহিত্যে যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ইহারা সর্পনামে অভিহিত হইলেও মানুষের রূপধারণক্ষম এবং মানুষের ন্যায়ই জীবনযাত্রা পরিচালনায় অভ্যস্ত জাতি বলিয়া দেখা যায়। এই জাতি যে সর্পপূজক ছিল তাহার বিবিধ

প্রমাণ রহিয়াছে। এই দিক দিয়া "নাগ" ইহাদের totem বা জাতীয় চিহ্ন ও ধর্ম্মের প্রতীকও হইতে পারে। "নাগ" শব্দের সংস্কৃতে বিভিন্ন অর্থ থাকিলেও এই জাতি সম্পর্কে এবং হয়তো ইহাদের স্বভাব লক্ষ্য করিবার ফলে ইহাদিগকে সর্প অর্থবাচক "নাগ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সংস্কৃতে প্রাপ্ত হইলেও "নাগ" শব্দটির (শ্যামদেশীয় "নাখ্") প্রকৃত মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিলে মন্দ হয় না। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষের বানর, হস্তী, পক্ষী, কচ্ছপ ও সর্প প্রভৃতি পূজক বা চিহ্নধারী জাতিগুলির সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারিবে। নাগ-জাতি সম্বন্ধে যতটা অবগত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় উত্তর-ভারত হইতে অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই জাতি প্রধানতঃ পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল মধ্যভারতবর্ষে এবং অংশতঃ উত্তর-ভারতের নানা অংশে ও দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাদের সংশ্রব একদিকে পূর্ব্ব-ভারতের Alpine বা Pamirian জাতিকে এবং অপরদিকে দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়গণকে সর্প-পূজকরূপে পরিণত অথবা সর্পপূজায় উৎসাহিত করিয়াছিল কিনা তাহা দেখা প্রয়োজন। নাগরাজ বাসুকী ও "অষ্টনাগে"র উপাখ্যান এই নাগজাতিকেই (Austric) নির্দ্দেশ করে কিনা কে বলিবে?

যাহা হউক, বাঙ্গালাদেশের সর্পপূজার ভিতরে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় এই উভয় জাতিরই কিছু কিছু দান থাকা অসম্ভব নহে। ইহা ছাড়া মঙ্গোলিয় (Tibeto-Burman) জাতি-গুলিরও বাঙ্গালা দেশের সর্পপূজার সহিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রাচ্যগণের আগমনের পূর্ব্বেই অষ্ট্রিকগণ মালয়, সুমাত্রা,

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সম্ভবতঃ দুই প্রকারে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহাদের একটি স্থলপথ ও অপরটি জলপথ। স্থলপথে ইহারা আরাকান ও উত্তর-ব্রহ্মের পথে সুরমা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (আসাম) ভেদ করিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। এই অষ্ট্রিকগণ আবার জলপথে সোজাসুজি বাঙ্গালার দক্ষিণভাগে, সমুদ্রের উপকূলে, অবতরণ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ, দক্ষিণ-বঙ্গ ও রাঢ়দেশের নানাস্থানে বসতিস্থাপন করিতে পারে। এইরূপে আল্পাইন গোষ্ঠীর পামিরিয়গণ সুদূর অতীতে মধ্যএসিয়ার প্রান্তবর্ত্তী ও হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তস্থ পামির (Pamir) অঞ্চল হইতে বোধ হয় ভারতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বাঙ্গালা দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহার ফলে এই জাতি ক্রমশঃ উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ব-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে ও বসবাস করিতে থাকে। আবার মঙ্গোলিয়গণের তিব্বত-ব্রহ্মী (Tibeto-Burman) এবং আরও কতিপয় শাখা ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে এই দেশে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ আসাম ও উত্তর-বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে অষ্ট্রিক ও আল্পাইন জাতিদ্বয়ের মধ্যে এবং উত্তর-বঙ্গে আল্পাইন, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় জাতিত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইবার কথা। কোন সময়ে পূর্ব্ব-ভারতে এই জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার লুপ্ত ইতিহাস এক দিন উদ্ধার হইবে কিনা কে বলিতে পারে। পামিরিয়ান জাতির শক্তি পূর্ব্ব-ভারতে অটুট ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী আগন্তুক দ্রাবিড়গণ পূর্ব্ব-ভারতের দিকে আর অধিক অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশের ও পশ্চিম-ভারতের পামিরিয়ানগণকে

ভেদ করিয়া সর্ব্বদক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহারা দক্ষিণ ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগে ততটা উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহার কারণ পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল এই দুই ভূভাগ অত্যন্ত দুর্গম। এই জন্য দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণাঞ্চল হইতে উত্তরাঞ্চলে, প্রাচীন কলিঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার পথে, বাঙ্গালাদেশে দ্রাবিড় জাতির যথেষ্ট সমাগম হয় নাই। তবুও বলা যায় যে দ্রাবিড়গণ আংশিকভাবে, বঙ্গোপসাগরের উপকূল দিয়া অথবা জলপথে, দক্ষিণ-রাঢ়ে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বসতিস্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গালাদেশ হইতেও কতক লোক দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গিয়াছিল। এই আগন্তুক দ্রাবিড়গণের সহিত দক্ষিণ-রাঢ়ের অষ্ট্রিকগণের সংগ্রাম বাধিবার কথা। একই কারণে উত্তর-রাঢ়ে অষ্ট্রিকগণ ও আগন্তুক বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটা অসম্ভব নহে। অবশ্য এই সব কথা এখনও কতটা কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্ন আর কতটা কঠোর ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা তাহা সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বিশেষজ্ঞগণ বর্ত্তমানে শুধু ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিকেও সম্যকভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে ভাল হয়। ইহার ফলে প্রাচীন ভারতের, তথা প্রাচীন বাঙ্গালার, জাতিগত ও সংস্কৃতি-গত অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক নূতন উপাদান তন্মধ্যে অন্যতম হওয়াই সম্ভব :

বৈদিক আর্য্যগণ পশ্চিম দিক হইতে বাঙ্গালায় আগমন করিয়া গঙ্গানদীর উভয়তীর ব্যাপী প্রাচীন গৌড়রাজ্যে ও এই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ কর্ণসুবর্ণরাজ্যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে। এই কারণে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণের

আগমনের পূর্ব্বে কয়েক শত বৎসর এক নূতন প্রেরণার আভাষ পাওয়া যায়। এই যুগে রাঢ়দেশ (বিশেষতঃ উত্তর-রাঢ়) ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া যথাক্রমে বৌদ্ধ, বৈদিক ও পৌরাণিক-আর্য্যসংস্কৃতির কেন্দ্র-স্থল হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের তান্ত্রিক আদর্শের সহিতও এই আর্য্যসংস্কৃতি সখ্যতা স্থাপন করিয়া এ দেশবাসীগণের জাতীয় জীবনে এক নূতন ঐক্যভাব জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

অষ্ট্রিকগণ উত্তর-বঙ্গে ও আসামে প্রথমে মঙ্গোলিয় জাতি ও পরে আল্লাইন জাতির নিকট পরাজিত হইয়া থাকিবে। ইহারা তখন ক্রমশঃ বিন্ধ্যের পার্ব্বত্যাঞ্চলের দিকে সরিয়া গেলেও যাহারা এই দেশে রহিয়া গেল তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। হিন্দুসমাজের সহিত কালক্রমে মিশিয়া গিয়া ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাঙ্গালায় জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই (অষ্ট্রিক জাতির যে যে প্রধান অবদান বা স্মৃতি-চিহ্ন বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে তাহা সর্প-পূজা। শিব-পূজক আল্লাইন (পামিরিয়) জাতি এই অষ্ট্রিকদিগের নিকট হইতে সর্প-দেবতার পূজা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এই সর্প-দেবতার স্ত্রীরূপ পরিকল্পনা কতকটা তান্ত্রিকতা ও কতকটা মঙ্গোলিয় প্রভাবের ফল হইতে পারে। আল্লাইনগণ মনসা-দেবীকে পাইবার পূর্ব্বেই শান্তি-পূর্ণভাবে অথবা মঙ্গোলীয়দিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে চণ্ডী-দেবীকে পাইয়া থাকিবে। হিমালয়ের রাজকন্যারূপে পরিকল্পিতা এই দেবীর উপর আর্য্যজাতি অপেক্ষা মঙ্গোলিয় জাতির দাবী অধিক মনে হয়। বিভিন্ন নামের স্ত্রীদেবতা প্রথমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূজিতা হইলেও পরিশেষে

হিমালয়ের এই দেবীর নামের অন্তরালে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়াছিলেন কিনা তাহাও দেখা যাইতে পারে। যে তান্ত্রিকতার সহিত স্ত্রীদেবতা-পূজার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতিগুলির মধ্যে সেই তান্ত্রিকতার প্রথম সংশ্রব সম্ভবতঃ মঙ্গোলিয় জাতির সহিতই হইয়াছিল। হরগৌরীর মিলন (তিব্বতীয় "Yab-Yum") তান্ত্রিক আল্পাইন ও শক্তিপূজক মঙ্গোলিয় জাতিদ্বয়ের মিলনের দ্যোতক কিনা কে বলিবে? পরবর্ত্তীকালে আল্পাইনগণ অষ্ট্রিকগণের সর্পপূজা যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহাও তান্ত্রিকতাপূর্ণ স্ত্রী-দেবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহার ফলেই হয়তো মনসা-পূজার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

চণ্ডী-দেবী ও মনসা-দেবীর প্রথম প্রচারক্ষেত্র হিসাবে স্থান-নির্দ্দেশ করিতে গেলে দুয়ার (ডুয়ার্স,) কুচবিহার ও কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে কোচজাতি, জয়ন্তীনগর, কামাখ্যা-দেবী প্রভৃতির উল্লেখ এবং হিমালয় প্রদেশে, উত্তর-বঙ্গে ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই দুই দেবীর পূজা-প্রসঙ্গে যে সব প্রাচীন বিবরণ ও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীনত্বের দিক দিয়া এই সব অঞ্চলই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অষ্ট্রিক জাতির সমুদ্র-প্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ মনসা-দেবীর জলের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে ইহার ফলে বাখরগঞ্জ জেলা বিশেষ করিয়া এই দেবীর পূজার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিবে। প্রথমে হালিক ও জালিক উভয় শ্রেণীর কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক এবং পরে সমুদ্রপথে বিচরণশীল বণিকজাতি কর্ত্তৃক এই দেবীর পূজার সাহিত্যিক বিবরণ এই উপলক্ষে আলোচনার যোগ্য। যাহা হউক বাঙ্গালার প্রাচীন জাতি-গুলির মধ্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার

প্রাচীন দেবদেবীগণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দেশ—যে বাঙ্গালা দেশে এই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার আয়তন ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশের সমতল ভূমি গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদবাহিত পলিমাটি হইতে ক্রমে ক্রমে গঠিত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য উর্ব্বর দেশ। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা সাহিত্য উভয়েই সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশ বলিতে এখন দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় শাসনসম্পর্কিত ইহার যে আয়তন বুঝিয়া থাকি, পূর্ব্বে ইহা সেরূপ বুঝাইত না। ভৌগোলিক, ভাষাগত, জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের দিক দিয়াও বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন রূপ এবং আয়তন কল্পনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক সব রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য করিয়া ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে "প্রাচ্য" নামে অভিহিত পূর্ব্ব-ভারতের প্রধান ভূভাগই এই বাঙ্গালা দেশ এবং প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্বপাকিস্তানসহ বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশদ্বয়ের সহিত আসাম প্রদেশ, প্রায় সমগ্র বিহার প্রদেশ (ছোটনাগপুর বিভাগসহ) ও উড়িষ্যা প্রদেশের বাঙ্গালার সীমান্তস্থ কতিপয় জেলা লইয়া প্রাচীন ও প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ গঠিত হইয়াছিল। "বঙ্গ" নামটি সুপ্রাচীন হিন্দুযুগে ইহার কিয়দংশ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইলেও "বঙ্গ" হইতে আগত "বাঙ্গালা" নামটি মুসলমানযুগে প্রথমে সমগ্র ভূভাগটিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। হিন্দুযুগে সমগ্র ভূভাগটিকে মোটামুটি বুঝাইতে এক "প্রাচ্য" কথাটি ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "বঙ্গ", "গৌড়" ও "সমতট" প্রভৃতি

নামগুলি এই উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ না হইলেও সময়বিশেষে কতকটা সাহায্য করিয়াছে। এই নামগুলির মধ্যে "বঙ্গ" নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার "পঞ্চগৌড়" রাজ্যের উল্লেখ হইতে "গৌড়" নামটিরও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।১

মহাভারতে বর্ণিত বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মনামক পঞ্চপুত্রের নাম হইতে পূর্ব্ব-ভারতে যে পাঁচটি প্রাচীন দেশের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই বোধ হয় সম্মিলিতভাবে প্রাচীন বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই পাঁচটি নাম প্রাচীন "আল্লাইন" (বা "পামিরিয়ান") অথবা "অষ্ট্রিক" জাতির পাঁচটি শাখাকেও নির্দ্দেশ করিতেছে কিনা তাহার সম্যক অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এই পাঁচটি প্রাচীন শাখাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলি ভিন্ন কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, কামরূপ, ত্রিপুরা ও কুচবিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা ভূভাগের অন্তর্গত হিসাবে এই রাজ্যগুলির কোন কোনটিকে গণ্য করিতে আপত্তি হইতে পারে। তবুও জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত কারণে আমরা এই সমস্ত রাজ্যকে প্রাচীন বাঙ্গালারই অন্তর্গত করিতে ইচ্ছুক। সহজ কথায় আয়তনের দিকে অধুনালুপ্ত মোগলযুগের "সুবে বাঙ্গালা" এবং কোন সময়ে "বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা" লইয়া গঠিত ও একজন লেঃ গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ প্রদেশটিকে অনেকাংশে প্রাচীন সমগ্র বাঙ্গলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal by B. C. Sen.

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর ও ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের অন্তর্গত ভূভাগে প্রাচীনকালে স্থুহ্ম বা রাঢ়, কর্ণস্থবর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত দেশ বা রাজ্যগুলি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কখনও ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর আবার কখনও ভৈরব নদের অথবা ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্ব তীর হইতে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা নদের মোহনা পর্য্যন্ত ভূখণ্ড প্রাচীনতম "বঙ্গ" (দক্ষিণ বঙ্গ) নামে পরিচিত ছিল। এই দেশের পূর্ব্বে অবস্থিত পদ্মা নদীর পূর্ব্ব-উত্তর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে "পূর্ব্ব বঙ্গ" বলিত। এই অংশের পূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলি কোন সময় "উপ-বঙ্গ" নামে পরিচিত থাকিলেও এখন ইহা "পূর্ব্ব-বঙ্গের" অন্তর্গত এবং অংশতঃ "সমতট" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলাও প্রকৃতপক্ষে এখন পূর্ব্ব-বঙ্গেরই অংশ মাত্র। উত্তর-বঙ্গের (রাজসাহি বিভাগ) মহানন্দা, তিস্তা, আত্রাই ও করতোয়া নামক চারিটি নদনদী প্রধান ও প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে করতোয়া উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্ব-সীমা, মহানন্দা পশ্চিম সীমা এবং তিস্তা উত্তর সীমা বলিয়া এক সময়ে ধার্য্য ছিল। এই ভূভাগের দক্ষিণ সীমায় গঙ্গা নদী। বর্ত্তমানে তিস্তার উত্তর-পূর্ব্ব তীর হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বৃহৎ ভূখণ্ডও ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য, গৌড়রাজ্য এবং বরেন্দ্রভূমি নামে অভিহিত অঞ্চল এই ভূভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান কুচবিহার রাজ্যও উত্তর-বঙ্গ নামে পরিচিত এই ভূভাগের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

বোধ হয় আল্পাইন জাতীয় পামিরিয়ানগণের প্রথম

উপনিবেশ উত্তর-বঙ্গ এবং দ্বিতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কামরূপ অঞ্চলেও এই শ্রেণীর ককেশীয় জাতির বসবাস ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান সত্য হইলে ব্রহ্মপুত্র নদের বর্ত্তমান প্রধান খাতের ও পদ্মা নদীর উভয় তীর এবং গঙ্গা নদীর বর্ত্তমান প্রধান খাতের উভয় তীর পামিরিয়ান জাতির উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। শুধু বর্ত্তমান ভাগীরথীর উভয় তীরে বৈদিক আর্য্য জাতির মূল উপনিবেশ প্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল এই অবস্থায় গত হইবার পর, রাজনৈতিক কারণপরম্পরাঁ, আর্য্যগণের আদর্শ ও উপনিবেশ প্রধানতঃ দক্ষিণ-বঙ্গের পথে পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বৃহৎ ভূভাগ (রাঢ়) উত্তর ও দক্ষিণ ভেদে "উত্তর-রাঢ়" ও "দক্ষিণ-রাঢ়" নামে পরিচিত। উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে অষ্ট্রিক জাতির এবং দক্ষিণ-রাঢ় অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন অস্তিত্বের চিহ্ন মিলিতে পারে। আর্য্যজাতি ভিন্ন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে মঙ্গোল এবং অষ্ট্রিক জাতিদ্বয়ের অস্তিত্বও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ উত্তর-বঙ্গ এবং ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় মঙ্গোল জাতির নিদর্শনেরও অভাব নাই। দক্ষিণ বা নিম্ন-বঙ্গের পশ্চিমাংশে প্রাচীন "বগড়ি", প্রদেশ। ইহা মহাভারতোক্ত বক-রাক্ষসের দেশ কিনা তাহা সঠিক বলা না গেলেও প্রচলিত "বঙ্গ-রাক্ষসৈঃ" কথাটি অন্ততঃ নিম্ন বা মূল বঙ্গে "রাক্ষস"-সংশ্রব (অষ্ট্রিক-সংশ্রব ?) নির্দ্দেশ করে। "নাগ" ও "রাক্ষস" উভয়েই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখা হইতে পারে। যদিও এই জাতিদ্বয়কে কেহ কেহ দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত করিবার পক্ষপাতী তবুও আমাদের মনে হয় ইহারা অষ্ট্রিক। এই সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন

অন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথ নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি মাধবাচার্য্য (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) মঙ্গল-চণ্ডীর অন্তর্গত "মঙ্গল" শব্দের ব্যাখ্যায় শুভসূচক না ধরিয়া দৈত্য বিশেষের নাম অর্থে শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হয়তো মঙ্গোল জাতির ইঙ্গিত। এতদ্ভিন্ন তন্ত্র-শাস্ত্রপ্রিয় পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিতে অনুস্বারের আধিক্য ভাষার দিকে মঙ্গোলিয় প্রভাব সূচিত করিতে পারে। পূর্ব্বে উল্লিখিত "মহাচীন" হইতে বশিষ্ঠ ঋষির "তারামন্ত্র" সংগ্রহের বিবরণটিতেও পূর্ব্ব-ভারতে তান্ত্রিক ও শাক্ত মঙ্গোলিয় প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গ, উত্তর-বঙ্গ ও আসামের পার্ব্বত্য জাতিগুলির বেশীর ভাগই মঙ্গোল-জাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে মঙ্গোলিয় প্রভাব বুঝাইতে "চীন" শব্দটি বিশেষ মূল্যবান। কোন সময়ে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য অঞ্চলের এবং ইহার বহির্ভাগস্থ দেশসমূহের অধিবাসিগণকে বুঝাইতে ভারতীয়গণ "চীন" কথাটি ব্যবহার করিত। এই অঞ্চলের বিদেশীয় জাতিকে বুঝাইতে "চীন" কথাটির ব্যবহার মঙ্গোলিয় জাতিগুলিকেই অধিক নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই সম্ভবতঃ ভারতের উত্তর-পূর্ব্বদিকের "চীন", "মহাচীন" ও "কাচীন" প্রভৃতি জাতিগুলিকে ও এই নামে পরিচিত দেশগুলিকে আমরা এখনও পাইতেছি। "চীন" হইতে "যক্ষ" নামটি বোধ হয় অধিক প্রাচীন। এই নামে সম্ভবতঃ হিমালয়ের পশ্চিম ও মধ্য-অঞ্চলের কতিপয় পামিরিয় বা "আল্পাইন" শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতিকেই বুঝাইত। "চীন" ও "যক্ষ" কথা দুইটি তিব্বত ও ভুটান ("ভূত" জাতির দেশ?) দেশীয় জাতি বিশেষকে কখনও কখনও বুঝাইত বলিয়া জানা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শাক্তশাখা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে

এবং বৈষ্ণবশাখা পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসিগণকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহা ছাড়া লৌকিক ধর্ম্মের অনেক ব্রতকথার ও ছড়া-পাঁচালীর উদ্ভব বাঙ্গালার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলে হইয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে উত্তর-বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় রাজ্যদ্বয় বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবন গঠনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত ও গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরস্থ রাঢ়দেশ কিছুকাল মধ্যযুগের অবৈষ্ণব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতরে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তনের দিকে ও জনসাধারণের মনোরঞ্জনের দিকে সচেষ্ট ছিল বলিয়া এই সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধনে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে বৃহত্তর বাঙ্গালাদেশে অনেক রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পালবংশ, সূরবংশ, সেন-বংশ, বর্ম্মনবংশ (দক্ষিণ-বঙ্গ ও কামরূপ), নাথবংশ, চন্দ্রবংশ, খড়্গবংশ, মাণিক্য বংশ (ত্রিপুরা), নারায়ণবংশ, (কুচবিহার), কেশরী ও গঙ্গবংশ (উড়িষ্যা), আহোমবংশ (আসাম), মণিপুর রাজবংশ, কাছাড়ী রাজবংশ ও অন্যান্য কতিপয় রাজবংশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকে সাহায্য করিয়া সুপ্রাচীন ও বৃহত্তর বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়সমূহ—

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে নারীচরিত্র বিশেষ আলোচনার যোগ্য। এই সব নারীচরিত্রকে প্রধানতঃ "বৌদ্ধ" ও "হিন্দু" এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। চরিত্রের দৃঢ়তা বা পরুষভাব দেখিলেই এই সব নারীচরিত্র বৌদ্ধগন্ধী এবং কোমলতা দেখিলেই ইহারা হিন্দুভাবাপন্ন বলিয়া অনুমিত হইয়া

আসিতেছে। ইহা ছাড়া কোন নারী যদি বহির্জগতে কর্ম্মপ্রবণা হয় তবে সেই নারীর ভিতরে বৌদ্ধ আদর্শ এবং যদি কোন নারী অত্যধিক স্বামীমুখাপেক্ষিণী ও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী হয় তবে তাহার মধ্যে হিন্দু আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধগণ কর্ম্ম ও হিন্দুগণ ভক্তি পথের পথিক এই ধারণা এইরূপ বিভাগের মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। আমরা কিন্তু নারীচরিত্রের এইরূপ ধর্ম্মগত বিভাগের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। নারীর চরিত্রের ভিতরে কোমলতা অথবা দৃঢ়তা বৌদ্ধ কি হিন্দু কোন সমাজেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সমাজেই এই উভয় স্বভাবের নারীই পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মগত নহে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া কোন কবি কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখাইতে প্রয়াস পাইলে তাহাতে ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য প্রমাণের চেষ্টা সমীচীন নহে। বৌদ্ধ সমাজের ও হিন্দু সমাজের এই আদর্শগত পার্থক্যের প্রমাণ নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোথায় পাওয়া যাইতেছে? দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের উদাহরণও উভয় সমাজের আদর্শ নারীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে কি? স্বামিভক্তি প্রদর্শন উপলক্ষে হিন্দু নারীর দৃঢ়চিত্ততার কোন অভাব দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন অন্তঃপুরের সীমার বাহিরে, অর্থাৎ বহির্জগতে, কোন নারী স্বভাবগত দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিলেই সেই নারীর আদর্শ হিন্দু না হইয়া বৌদ্ধ হইয়া যাইবে কেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। দেবতার প্রতি ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের এবং নিজের শক্তির উপর প্রত্যয় বা নির্ভরতা বিশেষভাবে বৌদ্ধপ্রভাবেরই ফল কিনা দেখা প্রয়োজন। নারীচরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভিন্ন আদর্শ গঠনে

তান্ত্রিকধর্ম্ম কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইহা নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা আছে। ধর্ম্মের দিকে এই তান্ত্রিকতা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজেই এক সময়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজই ভক্তিবাদ দ্বারা ক্রমে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত নারীদিগের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজ সাধারণতঃ খুব সদ্ভাবের সহিত পাশাপাশি বসবাস করার জন্য এবং তান্ত্রিকতা ও ভক্তিবাদ দ্বারা উভয় সমাজ প্রভাবিত হওয়ার জন্য উভয় সমাজের পুরুষ অথবা নারীজাতির ধর্ম্ম ও আদর্শগত পার্থক্য তেমন পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায় নাই।

যে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব হয় সেই যুগে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ পালরাজগণ প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহাদের বহুমুখী প্রতিভার কিছু কিছু চিহ্ন প্রাচীন ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পের ভিতরে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা এত বিরল কেন? তথাকথিত সংগুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের (ধর্ম্মঠাকুরের) চিহ্ন (যদি সত্য হয়) ব্যতীত তাঁহাদের রাজত্বের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের আর কোন বিশেষ পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতরে পাওয়া যায় না কেন? ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

কোন চরিত্রকে কবি বা সাহিত্যিক ইচ্ছামত মৃদু বা কঠোর করিতে পারেন, যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস বর্ণিত রামচরিত্র। একই চরিত্রের বিভিন্নভাবে সৃষ্টির মূলে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য প্রধান এবং কোন ধর্ম্মের প্রভাব অপ্রধান। ধর্ম্মের দ্বারা কোন চরিত্র

প্রভাবিত হইতে পারে সত্য কিন্তু ইহা গৌণ ব্যাপার, মুখ্য নহে। প্রাচীনকালে কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রচারের উদ্দেশ্যেই চরিত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা সত্য বটে। কিন্তু চরিত্র-গুলির ভিতর বিশেষ বিশেষ সময়ের বিভিন্ন ধর্ম্মের চিহ্ন প্রতিভাত হইলেও কবির সৃজনী শক্তিকে অবহেলা করিয়া শুধু ধর্ম্মের জোরে চরিত্রগুলি জীবন্ত হইতে পারে নাই। কোন ধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত ছড়াগুলি পরে কাব্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে দেখা যায় ইহাতে ধর্ম্মপ্রচার ক্রমশঃ বহিরঙ্গ ও কবিপ্রতিভা অন্তরঙ্গ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। একই চরিত্র বস্তুধর্ম্মী কবি যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন আদর্শধর্ম্মী কবি তাহা অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। অথচ কোন বিশেষ যুগের ধর্ম্মের আদর্শ হয়তো ঠিকই আছে। উদাহরণস্বরূপ কালকেতু, ধনপতি, চন্দ্রধর, বেহুলা, ফুল্লরা প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির সৃষ্টিকৌশলের ফলেই আদিতে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে রচিত ছড়াগুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। সমাজ ও ধর্ম্মগত আদর্শ অথবা আবেষ্টনী উৎকৃষ্ট কবিকে প্রভাবিত করিলেও চরিত্রগুলির ভিতর এমন একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায় যাহাকে কোন ধর্ম্মের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। কোন চরিত্রের ভিতর কোন্ অংশটি ইহার স্বভাবগত ও কোন্ অংশটি ধর্ম্মগত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। একই চরিত্র বিভিন্ন যুগে পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দিলেও মূল দুই একটি লক্ষণ বরাবরই একইরূপ থাকিয়া যায়। উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। রামচরিত্র মৃদু বা দৃঢ় যে ভাবেই চিত্রিত হউক না কেন, শাক্ত বা বৈষ্ণব যে ধর্ম্মের চিহ্নই রামচরিত্রে প্রতিভাত হউক না কেন, দেবতা বা মানুষ যে রূপেই এই চরিত্রের বর্ণনা থাকুক না কেন,—

তিনি যে একজন সদিচ্ছাপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ ছিলেন ইহা সকল কবিই উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে সকল কবিই একমত।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ময়নামতী, অহুনা, পহুনা, খনা, লহনা, খুল্লনা, সুশীলা, ফুল্লরা, লক্ষ্মী, কলিঙ্গা, কানেড়া, রঞ্জাবতী, বেহুলা, সনকা, সীতা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সত্যভামা, গান্ধারী, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহুয়া, মলুয়া, মালঞ্চমালা প্রভৃতি চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ধর্ম্মের প্রভাব, সমাজের প্রভাব, ভাষার প্রভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও কবির নিজস্ব প্রভাব প্রভৃতি যাহাই চরিত্রগুলির উপর পড়ুক না কেন, এই চরিত্রগুলির মধ্যে মূলগত বৈষম্য অল্প এবং মিল বেশী। আপাতদৃষ্টিতে একটি চরিত্র অপরটি হইতে খুব পৃথক মনে হইলেও কোমলে-কঠোরে গঠিত এই মহীয়সী নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সংস্কৃতিগত ও আদর্শগত আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য প্রচুরভাবে রহিয়া গিয়াছে। জীবনের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সকলেরই একরূপ এবং গৃহের অভ্যন্তরে, পারিবারিক জীবনের মধ্যে শান্তি সকল নারীরই কাম্য। স্বামীর প্রতি বশ্যতা ও ভক্তির প্রকাশ প্রাচীন-যুগের লক্ষণ হিসাবে সকল নারীর মধ্যেই প্রচুরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বহির্জগতের সহিত নারীজাতির মেলামেশার অধিকার, লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা, বহুপত্নীক স্বামীর গৃহে নারীর সুখ-শান্তির অবস্থা, কতিপয় কুপ্রথার প্রবর্ত্তনে নারী-জাতির ক্ষুণ্ণতা, নারী এবং পুরুষের সমাজে ও সম্পত্তিতে বিশেষ স্থান ও অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে যুগে যুগে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং কবির কাব্যে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং নারী বা পুরুষ-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কোন কাব্যে চরিত্র-বর্ণনা শুধু ধর্ম্মগত ব্যাপার

নহে, বরং ইহা জাতির আদর্শগত এবং ব্যক্তিগত বিষয়ও বটে।

আধুনিক উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী জাতির অনেকের পূর্ব্বপুরুষ যদি আল্পাইন আর্য্যগণ বলিয়াই সাব্যস্ত হয় তবে তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও সভ্যতা প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য কতিপয় জাতির সংশ্রবের ফলে রূপান্তরিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, প্রাচীন ব্রতকথা ও রূপকথা প্রভৃতি আলোচনা করিলে, বাঙ্গালী জাতির রুচি ও প্রকৃতি অনুধাবন করিলে—এই জাতিগত প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্যক বুঝা যাইবে। বিভিন্ন যুগে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন জাতির সাহিত্যে যে আভ্যন্তরীণ নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে জাতিগত প্রশ্ন বিচার করিয়া তাহার উপর ধর্ম্মগত, সমাজগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-সমূহের তুলনামূলক বিচার করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই আমরা যে কোন চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও আদর্শ বুঝিতে সক্ষম হইব। প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষচরিত্র নারীচরিত্রের কাছে যেন কতকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন জাতিগুলির সমাজব্যবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় কোন জাতির ভিতরে পুরুষের আবার কোন জাতির ভিতরে নারীর প্রাধান্য। ইহার কারণ কোন জাতির সমাজে মাতার (Matriarchal) কর্ত্তৃত্ব এবং কোন জাতির সমাজে পিতার (Patriarchal) কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ স্মরণাতীতকালে ইহাদের

মধ্যে কোন্ সামাজিক আদর্শ অবলম্বন করিত (বা আংশিক ভাবে তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইত) তাহা নির্ণয় করা সঙ্গত। প্রথমে বাঙ্গালী সমাজে নারীজাতির সামাজিক অধিকার, শিক্ষা ও আদর্শ কিরূপ ছিল ও ক্রমে বিভিন্ন জাতির সামাজিক ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থার সংঘাতে এবং ইহার সহিত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সহিত জড়িত হইবার ফলে বাঙ্গালী নারীর আদর্শ তথা সামাজিক উত্থান-পতন বা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কত বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহার লুপ্ত কাহিনী এখনও উদ্ধার হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার কতকটা চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে মাত্র।

ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, নানাপ্রকার শিল্প ও শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ মূল্যবান তথ্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। এই সাহিত্য পাঠে এমনও ধারণা হয় যে এক সময়ে কৃষি ও বাণিজ্য উভয়ই জাতির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কৃষি সম্বন্ধে কোন কোন মন্তব্য পাঠ করিলে দেখা যায় ইহাকে বাণিজ্য অপেক্ষাও অধিক গৌরব দেওয়া হইত। খনার বচনে কৃষি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া শিবায়ন গ্রন্থেও নানাস্থানে কৃষির কথা আছে। অপরপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিকদিগের সমুদ্রপথে নানা দূর দেশে বাণিজ্যযাত্রার গৌরবময় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই বিবরণগুলিতে কবিজনোচিত অনেক অতিশয়োক্তি থাকিলেও অনেক কথার সত্যতাও রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতশ্রেণী এবং কৃষি-কার্য্যের উপর নির্ভরশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হিন্দুসমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর অভাব কতকটা পূরণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা স্ত্রীপুরুষ ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল। স্ত্রীস্বাধীনতার পরিমাণ এক এক সময়ে এক এক রূপ ছিল। শুধু লিখিতে পড়িতে জানার উপরই সাধারণ শিক্ষা নির্ভর করিত না। উহা মুখে মুখে আলোচিত হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া কারিগরি শিক্ষারও ভাল ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার নীতি-গত অংশটুকু দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কারিগরি শিক্ষার দিকে বিভিন্ন হিন্দুজাতি বংশানুক্রমিক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া উহাই তাহাদের জীবিকা সংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, কাংস্যকার, মালাকার প্রভৃতি জাতিগুলির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ ও মুসলমানগণ মধ্যযুগে পরম সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বাস করিত। মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য না হইত এমন নহে, তবে তাহা খুব কম হইত। মুসলমান শাসকগণ হিন্দুগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধানে ইঁহাদের অনেকে যত্নবান ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে অনেক মুসলমান কবির দান রহিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবময় মধ্যযুগে আলোচনার অনেক বিষয় রহিয়াছে। ইহার সাহিত্যিক বিষয়গুলির মধ্যে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য (Subjectivity), বিষয়বস্তুর গুরুত্ব (Objectivity), কতকটা মহাকাব্য (Epic) ও গীতিকাব্যের (Lyric) রীতির সাদৃশ্য, বিভিন্ন প্রকারের হাস্যরস ও করুণরস, প্রেম-বৈচিত্র্য, ভাষার ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয়

বিষয়ের সমাধান সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সমালোচকগণ করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যের কাব্যগুলির মূল পুথি অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। কবিগণেরও সঠিক পরিচয় সব সময় পাওয়া কঠিন ব্যাপার। বৈষ্ণব সাহিত্যের চণ্ডীদাস এবং মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের নারায়ণদেবকে নিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। চণ্ডীদাস-সমস্যা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে নারায়ণদেব বাঙ্গালী কবি কি আসাম দেশীয় কবি ইহা নিয়া মতভেদ চলিতেছে। অনুমানিক খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর কবি "সুকবি" নারায়ণদেবের সঠিক সময় নির্দ্ধারণ আর একটি কঠিন সমস্যা। পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গলের বাঙ্গালী কবি নারায়ণদেবকে কোন কোন আসামের অধিবাসী তাঁহাদের স্বদেশীয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে অন্ততঃ কবির স্বদেশ বাঙ্গালাদেশের বাহিরে তাঁহার যশঃসৌরভের ব্যাপ্তিতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বপ্রান্তবাসী কবির জন্মভূমি হইতে আসাম-সীমান্ত অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এমন কি কামরূপ-রাজগণও সময় সময় এই ভূভাগ শাসন করিতেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের (পূর্ব্ব-বঙ্গের) অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার সহিত আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ প্রভৃতি জেলার বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যে কোন কারণেই হউক "সুকবি" নারায়ণদেবের আসামে গতিবিধি থাকা অসম্ভব নহে। মনসামঙ্গল কাহিনীর বিশেষ চরিত্র চাঁদসদাগরের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী সাগর-মেখলা বাঙ্গালাদেশকেই নির্দ্দেশ করে, সমুদ্র-বর্জ্জিত আসামদেশকে নহে। এই উপলক্ষে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ

বাঙ্গালী কবিদ্বারা যতটা সম্ভব আসামবাসী কবিদ্বারা ততটা নহে। নারায়ণ দেবের কাব্যে স্ত্রী-আচারের যে বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে তাহা বাঙ্গালাদেশকেই নির্দ্দেশ করে। তবে পরবর্ত্তীকালে নানা কবির হস্তক্ষেপের ফলে স্থান-বিশেষের, এমন কি দেশান্তরের, স্ত্রী-আচারও ইহাতে উল্লিখিত হইতে পারে। নারায়ণ দেব কর্ত্তৃক চৈতন্য সম্বন্ধে কিছু রচনার কথা (সত্য হইলে) এইরূপেই আসাম-অঞ্চলে উদ্ভব হইতে পারে। অবশ্য এই রচনার কথা শুনিয়াছি মাত্র, দেখি নাই। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত রচনার অভাব নাই।

পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ হইতে আসামে বাঙ্গালীগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে বাঙ্গালার সহিত আসামের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের অসমিয়া সংস্করণে অসমিয়া ভাষার ব্যবহারের সহিত স্থানে স্থানে ঘটনাসমূহের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। ভাষা সম্বন্ধে বলা যায়, অসমিয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই প্রাদেশিক সংস্করণ মাত্র। বর্ণিত কাহিনীর বিভিন্ন পুথিতে রূপান্তর প্রাচীন পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন আর কিছু নহে। নারায়ণ দেব উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসামে একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। রাঢ় অঞ্চলেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। পদ্মাপুরাণের (মনসা-মঙ্গলের) এই কবিকে নিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দুই প্রদেশের বিবাদে বাঙ্গালী কবি জয়দেব ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিগত সাতাশ বৎসর যাবৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আমি অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করি। এই সুদীর্ঘ

সময়ের মধ্যে আমার কতকগুলি প্রবন্ধ হারাইয়া যাওয়াতে বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে। যে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে আমার লেখাগুলি ছাপাইয়াছিলাম তাহারও কতকগুলি ইতোমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে ছাপা লেখাগুলি বর্ত্তমানে আমার কাছে রহিয়াছে তাহাও এখন ক্রমে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া আমার শ্রমলব্ধ ফলের কিয়দংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিলেও এখন দেখিতেছি ইহা আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। লেখাগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিলে ইহা হইতে একদিকে যেমন আমার পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাটি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার সুবিধা হয় না, অপরপক্ষে জনসাধারণকেও এই সম্বন্ধে আমার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত করিবার সুযোগ ঘটে না। এই কারণে আমার বহু পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে একবার ছাপা হইয়া গেলেও পুনরায় ইহাদিগকে একত্র গ্রথিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, নতুবা একবার মুদ্রিত লেখাগুলি পুনরায় ছাপাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালা ও ইংরেজি—এই উভয় ভাষাতেই লেখা। এইজন্য ভাষার ভিত্তিতে ইহা দুই অংশে প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তিকায় "ভারতীয় প্রাচ্যভূমি ও মহাবঙ্গ" নামক আমার প্রবন্ধটি (আংশিক বিষয়-বস্তু ছাড়া) পূর্ব্বে কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির নাম ও যে যে সাময়িক পত্রে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার নির্দ্দেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালা প্রবন্ধ

১। ভারতীয় প্রাচ্য-ভূমি ও মহাবঙ্গ (নূতন)

২। বাঙ্গালার কথাসাহিত্য (পাঞ্চজন্য, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪২)

৩। নাথধর্ম্ম (ইতিহাস ও আলোচনা, শ্রাবণ, ১৩২৮)

৪। গোপীচন্দ্র (বঙ্গবাণী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪০)

৫। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য
(মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ, ১৩৩৬)

৬। বাঙ্গালা রামায়ণ (পাঞ্চজন্য, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪)

৭। পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকা (পাঞ্চজন্য, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১)

৮। সেকালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য (বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক, ১৩৩৩)

৯। বাঙ্গালীর অস্ত্রশস্ত্র (বিশ্ববাণী, আষাঢ়, ১৩৩৪)

১০। সেকালের বঙ্গনারীর অলঙ্কার (বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন, ১৩৫১)

ইংরেজী প্রবন্ধ

1. Religious Cults and Literature of Mediaeval Bengal (The Calcutta Review, Feb. 1932).

2. Mediaeval Bengali Literature (The Calcutta Review, June, 1934)

3. Mukundaram & other Poets of the Chandi Cult (The Calcutta Review, March, 1928).

4. A Visit to Brindaban (The Calcutta Review, November, 1937).

5. Raja Ganesh (The Journal of the Dept. of Letters, C. U. Vol. 23).

6. A Page from Old Bengali Literature (The Calcutta Review, April, 1927)

7. The Maritime Activities of Ancient Bengal (The Bombay Chronicle, Special Congress number, 1925)

8. The Nobility of Bengal in Old Bengali Literature (Journal of the Dept. of Letters, C. U. Vol. 22)

এই গ্রন্থে আমি যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছি তাহা সকলেই সমর্থন করিবেন এইরূপ ভরসা রাখি না। আমার মতামতের ভিতরেও কিছু ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। আমার অভিমত সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও আমি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে রূপটি নিজে অনুভব করিয়াছি তাহাই অকপটে সুধীজনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ অন্ততঃ এই কথাটি অনুধাবন করিয়া আমার লেখাগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভারগ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সুচারুরূপে ও শীঘ্র এই গ্রন্থ মুদ্রণ উপলক্ষে নানারূপ সাহায্যের জন্য বন্ধুবর শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার), আমার প্রাক্তন ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীবারীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. এবং শ্রীসরস্বতী প্রেসের সহকর্ম্মিগণসহ শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা জুলাই, ১৯৪৮

শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

ভারতীয় "প্রাচ্য"ভূমি

ও

"মহাবঙ্গ" (বৃহত্তর বঙ্গ)

ভারতবর্ষ প্রায় মহাদেশতুল্য একটি বিরাট দেশ। এই দেশে আনুমানিক চল্লিশ কোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশের উত্তর-পূর্ব্বভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক জটিল প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক কতিপয় প্রশ্নই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের অধিবাসিগণ একজাতীয় নহে, নানাজাতীয়। বর্ত্তমানে ইহারা এই দেশের বিভিন্ন অংশে যেভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ককেশীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত "বৈদিক আর্য্য"গণ উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-মধ্য ভারতে, "প্রাচ্য" বা "পামিরিয়"গণ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ও আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে এবং "দ্রাবিড়"গণ সর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতের উত্তর ভাগে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, "মঙ্গোলিয়" গোষ্ঠীর তিব্বত-ব্রহ্মী, থাই প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা বাস করিতেছে। এইরূপ মধ্য-ভারতের বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং গণ্ডোয়ানার মালভূমিতে

"অষ্ট্রিক" গোষ্ঠীর অন্তর্গত "মুণ্ডারি" বা "কোলারিয়"গণ বসবাস করিয়া আসিতেছে। সুপ্রাচীন "নেগ্রিটো" গোষ্ঠীর অতি অল্প নিদর্শনই এখন ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ইহারাই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। ইহাদের পরে "অষ্ট্রিক"গণ ও তৎপর "ককেশিয়"গণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বার পথে যথাক্রমে এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে অথবা "ককেশিয়"-গণের সমকালে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের পার্ব্বত্য দ্বারপথে "মঙ্গোলিয়"গণ ভারতে আগমন করিয়া থাকিবে। "অষ্ট্রিক"গণ ও মঙ্গোলিয়গণকে বাদ দিলে ককেশিয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত "বৈদিক আর্য্য", "দ্রাবিড়" ও "প্রাচ্য" (পামিরিয়) জাতিত্রয়কেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অধিবাসীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জনসংখ্যায়ও ইহারাই অধিক। ককেশিয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর্য্য, ইরাণীয়, তুরাণীয়, সেমেটিক, হেমেটিক, জাফেটিক প্রভৃতি শাখাবোধক নামগুলি এখন শুধু ভাষাতত্ত্বগত ও সংস্কৃতিগত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৃতত্ত্ববিদগণ অধুনা ককেশিয়গণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা,—"উত্তর-দেশীয়" (Nordic), "সামুদ্রিক" (Proto-Mediterranean) এবং "পার্ব্বত্য" (Alpine) জাতি। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের "বৈদিক আর্য্য", "দ্রাবিড়" এবং "প্রাচ্য" বা "পামিরিয়" জাতি তিনটীর মধ্যেই উল্লিখিত বিভাগত্রয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ইহা আলোচনার বিষয় বটে।

ভৌগোলিক বিশেষত্বের দিক দিয়া ভারতকে মূলতঃ চারিটী প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা,— হিমালয় প্রদেশ (উত্তরাখণ্ড), উত্তর-ভারতের সমতল ভূমি (আর্য্যাবর্ত্ত), দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণাপথ) এবং সর্ব্ব-দক্ষিণ

ভারত (দ্রাবিড়)। উত্তর-ভারতের সমতল ভূমি বা আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। ইহার পশ্চিমাংশ "উত্তরাপথ", মধ্য-অংশ "মধ্য-দেশ" এবং পূর্ব্বাংশ "প্রাচ্য" নামে সুপরিচিত। দক্ষিণ-ভারত উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই পার্ব্বত্য উপকূলকেও স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক বিভাগ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। তবে এই শেষোক্ত বিভাগ আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে।

এই স্বাভাবিক অঞ্চলগুলির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহ আপন আপন সমাজ ব্যবস্থা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহা সত্য হইলে ভারতবর্ষকে সংস্কৃতি ও জাতিগত ভাবে পাঁচটি মণ্ডলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক দিক হইতে আমরা ভারতবর্ষকে প্রধান চারিভাগে ভাগ করিয়া উপবিভাগ উপলক্ষে ইহাকে ছয়ভাগে ভাগ করিয়াছি। রক্তে ও সংস্কৃতিতে যদিও কোন জাতি এখন আর অবিমিশ্র নাই তবুও মোটামুটি সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের পাঁচটি মণ্ডল স্বীকার করিতে হয়। যথা,—উত্তরাপথ, মধ্যদেশ, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ ও দ্রাবিড়। ককেশিয় জাতিগুলিই এই মণ্ডলসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় জাতিগুলির উপর তাহাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলকে আর্য্যাবর্ত্তের তিনটি মণ্ডলের সহিত যুক্ত করিবার সংস্কৃতিগত কারণ ভিন্ন রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের অধিবাসী অনুন্নত মঙ্গোলিয় জাতিগুলি সর্ব্বদা ভারতীয় ও উন্নত আর্য্যজাতিসমূহের নেতৃত্বে, আদর্শে বা সংস্রবে বাস করিয়া অধিক লাভবান হইয়া আসিতেছে। মধ্যভারত ও গণ্ডোয়ানার অষ্ট্রিক জাতিসমূহ

সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই মঙ্গোলিয় ও অষ্ট্রিক জাতিগুলির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা ককেশিয় জাতিগুলির সহিত তাহাদের মিশিবার সুযোগ দেওয়াই অধিক সঙ্গত। ককেশিয় জাতিগুলির নেতৃত্ব ও নির্দ্দেশই এই মঙ্গোলিয় এবং অষ্ট্রিক জাতিগুলির পক্ষে অধিক লাভজনক ও মঙ্গলদায়ক।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য বৈদিক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া উত্তরাপথ, মধ্যদেশ (আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যাংশ) ও দক্ষিণাপথের অধিবাসীগণকে যতটা আকৃষ্ট করিয়াছিল প্রাচ্য ও দ্রাবিড় দেশের জনগণকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ইহার কারণ প্রাচ্য ছাড়া আর্য্যাবর্ত্তে এবং আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে বৈদিক আর্য্যগণের উপনিবেশ ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করিয়াছিল। এই হেতু পামিরিয় এবং এই সঙ্গে অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় প্রভৃতি জাতিগুলির বাসভূমি হিসাবে প্রাচ্যভূমি এবং দ্রাবিড়জাতির ও কিয়ৎপরিমাণে নেগ্রিটোজাতির বাসস্থান হিসাবে দ্রাবিড়দেশ বৈদিক আর্য্যগণের নিকট ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহারা প্রাচ্যদেশ ও ইহার অধিবাসীগণ সম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের অনেক পরবর্ত্তী কালে গ্রীকগণ এই প্রাচ্যগণ (গ্রীক Prasii) সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রাচ্যগণ প্রধানতঃ আল্পাইন জাতীয় পামিরিয়ান (Round-headed Pamirians) এবং "ব্রাত্য"(?) জাতি বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন ককেশিয় জাতিগুলির সহিত অপর নানাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির সংমিশ্রণে এখন ভারতবর্ষে যে সব

প্রাদেশিক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে রাজপুতগণ ও পাঞ্জাবীগণ উত্তরাপথের, হিন্দুস্থানীগণ মধ্য-আর্য্যাবর্ত্ত, "মধ্যদেশ" অথবা "হিন্দুস্থানের" এবং বাঙ্গালীগণ প্রাচ্যদেশের উল্লেখযোগ্য জাতিসমূহ। এইরূপ মারাঠাগণ (প্রধানতঃ আল্লাইন) দক্ষিণাপথের এবং তামিল, তেলেগু (অন্ধ্র), কানাড়ী ও মালয়ালম প্রভৃতি সমন্বিত দ্রাবিড়জাতি দ্রাবিড়দেশের প্রসিদ্ধ অধিবাসী বলা যাইতে পারে। নানাজাতির সংমিশ্রণে এই প্রাদেশিক জাতিগুলি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ইহাদের মধ্যে আর্য্যসংস্কৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা গেলেও মূলতঃ বা মূখ্যতঃ অনেকেই আর্য্যেতর। আর্য্যগণ বিরাট ককেশিয় জাতির একটি শাখা মাত্র। এই ককেশিয় জাতির অপর শাখাগুলিও যেমন আর্য্যেতর, মঙ্গোলিয় ও অষ্ট্রিকগণও তেমন আর্য্যেতর। এই আর্য্যেতর জাতিগুলির সকলকে একযোগে "অসভ্য" অর্থে "অনার্য্য" আখ্যা দিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। "আর্য্য" কথাটি এক সময়ে শুধু জাতিবাচক না হইয়া "ইন্দ্র-পূজক" অর্থেও ব্যবহৃত হইত। আর্য্য ভিন্ন অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যেও অনেক সুসভ্য জাতি ছিল।

বাঙ্গালীগণের স্বদেশ বাঙ্গালাদেশ ভারতের পূর্ব্ব ভাগের প্রাচ্য-ভূখণ্ডের অন্তর্গত। প্রাচ্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য অধিবাসী বাঙ্গালীগণ নানাদিক দিয়া ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসিগণ হইতে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের, অধিবাসীগণের ধর্ম্মমতের আদর্শ বেদ হইতে আগত হইয়াছে, অপরপক্ষে প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মমত তন্ত্র-শাস্ত্রের সহিতই অধিক সম্বন্ধযুক্ত, ইহা সাধারণ মত। তন্ত্র-শাস্ত্র সংস্কৃত পুরাণগুলির ন্যায় এতদ্দেশীয় প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদিগকে

বিশেষ সাহায্য করে। তন্ত্রশাস্ত্রগুলিতে দর্শন, সাধারণ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, শরীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়।

তন্ত্র-শাস্ত্র আদৌ বেদ হইতে আসিয়াছে কিনা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ ইহার উৎপত্তিস্থল অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। ইহার নির্দ্দিষ্ট আচার ও আদর্শ যে বৈদিক আচার ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সহিতই যে ইহার বিশেষ সম্পর্ক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তন্ত্র-শাস্ত্রের আদর্শ ভিন্ন, বাঙ্গালী জাতির নানাদিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি মনিষীগণ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব-ভারত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, জৈন-ধর্ম্ম, ভক্তি-শাস্ত্র, নব্য-ন্যায়, জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রভৃতি প্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র তথা অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তাধারার এক নূতন রূপ দান করিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে পূর্ব্ব-ভারতের মগধরাজ্য ও ইহার রাজধানী পাটলিপুত্র একদা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। মহাভারতের যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতের দিল্লী মহানগরী (প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ) যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল, এক সময়ে রাজ-গৃহের রাজশক্তির উত্তরাধিকারী পূর্ব্ব-ভারতের পাটলিপুত্র মহানগরীও তদ্রূপ সমগ্র ভারতের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে সেই প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করিয়াছিল।

মিথিলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত দানও অল্প নহে। বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত নালন্দা ও বিক্রমশীলার প্রাচীন বিহারদ্বয়ের বৌদ্ধযুগে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মহাভারতের যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্মরাজ্যের গৌরবময় উল্লেখ নানা সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বিহারের অন্তর্গত মগধ ও মিথিলা ভিন্ন উত্তরবঙ্গে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগে) গৌড়রাজ্য, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কোচবিহার রাজ্য, দক্ষিণ-বঙ্গে কর্ণসুবর্ণরাজ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে বঙ্গরাজ্য ও ত্রিপুরারাজ্য, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপ রাজ্য, আসামের সুরমা উপত্যকায় কাছাড়রাজ্য এবং প্রাচ্যের পূর্ব্ব সীমান্তে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের অধিবাসিগণকে হিন্দু-বৌদ্ধযুগে গৌরবের সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য, উড়িষ্যা, চম্পা (বিহারের অন্তর্গত), নেপাল ও আরাকান রাজ্যের নামও করা যাইতে পারে।

এই "প্রাচ্য" অংশের অধিবাসিগণের প্রাচীন ও প্রধান বংশধর আধুনিক বাঙ্গালীজাতি। বাঙ্গালীগণ বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের অধিবাসী থাকিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার করিয়া এবং সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়া বাঙ্গালার সীমা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই প্রদেশগুলি আমাদের প্রাক্তন শাসকগণের সৃষ্ট। "প্রাচ্যের" প্রদেশগুলির শাসন-সম্বন্ধীয় অথবা রাজনৈতিক বিভিন্নতা ভুলিয়া আমরা যদি এই ভূভাগের অধিবাসিগণের ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের দিকে এবং দেশটীর প্রাকৃতিক বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার সীমানির্দ্দেশ করি তবে দেখিতে পাইব উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে পাতকোই ও লুসাই

পাহাড়শ্রেণী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও গোদাবরী নদী এবং পশ্চিমে বস্তর নামক দেশীয় রাজ্যের সবটা বা অধিকাংশ, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি এবং মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগ ইহার অন্তর্গত। সমস্ত ছোটনাগপুর বিভাগ ও মধ্যভারতের কিয়দংশ এবং পূর্ণিয়া জেলাও প্রাচ্যের সীমার মধ্যে পড়ে। পশ্চিমে মহাকাল (মাইকাল) পর্ব্বতশ্রেণী একটি স্বাভাবিক সীমারেখা নির্দ্দেশ করে। ইহা ভিন্ন পশ্চিম দিকে সমস্ত বিহার প্রদেশ অথবা অন্ততঃ ইহার দুই তিনটী জেলা, উত্তর দিকে নেপাল এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরাকান প্রদেশও ইহার অন্তর্গত হওয়া একান্ত সঙ্গত। পূর্ব্বদিকে স্বাভাবিক সীমা আরও বৃদ্ধি করিলে উত্তর-ব্রহ্মের পশ্চিমভাগের (অর্থাৎ কোচিন ও চীন অঞ্চল) কিয়দংশ লইয়া ইরাবতী নদীকে এই দিকের প্রাকৃতিক সীমা ধরিয়া লইলেও বোধ হয় অন্যায় হয় না। বাঙ্গালী জাতির কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ ব্রহ্মদেশের এই জনবিরল ও অনুন্নত অধিবাসীপূর্ণ অঞ্চল প্রাচ্যের অন্তর্গত করিয়া লওয়াই খুব সমীচীন।

এই বিস্তৃত ভূভাগ প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই ভূখণ্ডে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ভূমি, অমূল্য খণিজ সম্পদপূর্ণ পার্ব্বত্যভূমি, প্রচুর আরণ্যসম্পদযুক্ত বিশাল ভূখণ্ড, বিরাট মালভূমি অসংখ্য শাখানদী ও উপনদী সমন্বিত ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা প্রভৃতি বিশাল নদ-নদী, বহু নদনদী ও খাল-বিল জাত অমূল্য মৎস্যসম্পদ সম্ভবতঃ এই প্রাচ্যদেশকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করিয়াছে। ভারতবর্ষের কোন অংশ এরূপ সম্পদশালিনী নহে। এই প্রাচ্যদেশের আয়তন দৈর্ঘে প্রায় বারশত মাইল এবং প্রস্থে চারিশত হইতে প্রায় আটশত মাইল হইবে।

এই দেশটি যেমন বিশাল ইহার জলবায়ুও তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। শীত-প্রধান, গ্রীষ্ম-প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ এই তিন প্রকার অঞ্চলই প্রাচ্যদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূলভাগও অনেক স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার ফলে প্রাচ্যের অধিবাসিগণকে সমুদ্রপথে যাতায়াত, নৌবাণিজ্য ও বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও অত্যন্ত মনোরম।

"প্রাচ্য"দেশে ককেশিয় জাতির তিনটী শাখাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তর-পূর্ব্ব হইতে আগত অনার্য্য মঙ্গোলিয় জাতির তিব্বত-ব্রহ্মী শাখা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আগত অনার্য্য অস্ট্রিক জাতির কোলারিয় বা মুণ্ডারি শাখাও প্রাচ্যদেশে বহুদিন যাবৎ বসতি স্থাপন করিয়াছে। তিব্বত-ব্রহ্মী ও মুণ্ডারিগণের মধ্যে অনুন্নত জাতির অভাব নাই। ককেশিয় জাতিগুলি সভ্যতার স্তরে অতিশয় উন্নত এবং ইহাদের অন্তর্গত যাহারা প্রাচ্যের অধিবাসী তাহাদের রক্ত অনেক ক্ষেত্রেই আর অবিমিশ্র নাই। তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে বাঙ্গালীগণই প্রধান এবং অধিকাংশই বোধহয় "অষ্ট্রো-আল্পাইন।" ইহাদের পরে অসমীয়া, উড়িয়া, বিহারি (দক্ষিণ), মৈথিলি, নেপালি, কাছাড়ি ও মণিপুরি প্রভৃতি প্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য জাতি। তিব্বত-ব্রহ্মী অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, কুকি, চাক্‌মা, লুসাই, নাগা, সিংফো, মিশ্‌মি, মিকির, ডাফ্‌লা, আকা, আবর, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতির এবং মুণ্ডারি জাতিগুলির মধ্যে কোল, হো, চুয়াড়, উরাঙ, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, খোড়িয়া, সাঁওতাল, খন্দ, গোণ্ড প্রভৃতি জাতির নাম করা যাইতে পারে। এই দেশে ধর্ম্মহিসাবে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন,

মুসলমান, খৃষ্টান এবং ভূতপ্রেত প্রভৃতির উপাসক নানা জাতি রহিয়াছে।

লোক সংখ্যার অনুপাতে অষ্ট্রিক-মঙ্গোল সংমিশ্রিত ককেশিয় জাতির বংশধরগণই প্রাচ্যে গরিষ্ঠজাতি। বোধহয় মঙ্গোলিয়গণ (ব্রহ্ম দেশের অংশসহ) সংখ্যায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতে পারে। মুণ্ডারিগণ তাহা হইলে সংখ্যা হিসাবে তৃতীয় স্থান পাইবার যোগ্য। অনার্য্য মঙ্গোলিয়গণ এক মুণ্ডারিগণ অপেক্ষা আর্য্য জাতীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত সংমিশ্রণও অত্যন্ত অধিক। ধর্ম্ম হিসাবে প্রাচ্য-দেশে মোটামুটি হিন্দু ও বৌদ্ধ মিলিয়া সাড়ে আট কোটী, মুসলমান পাঁচ কোটি এবং অনার্য্য দেবতার উপাসক ও অন্যান্য ধর্ম্ম মিলিয়া দুই কোটি লোক হইবার কথা। অবশ্য লোকসংখ্যার হিসাবে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। তবু ইহা লোকসংখ্যার মোটামুটি একটা ধারণা করিতে আমাদিগকে সাহায্য করে।

প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বাঙ্গালা প্রদেশই আয়তনে ও লোকসংখ্যায় অপরাপর অংশ হইতে প্রধান। বৃটিশ শাসিত এই বাঙ্গালা প্রদেশের লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় কোটির মত। এই সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু কম হিন্দু এবং অর্দ্ধেকের কিছু বেশী মুসলমান। প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ "বাঙ্গালা" প্রাক্তন ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরেও অনেকখানি স্থানে ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির অর্থাৎ উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার প্রদেশের অন্তর্গত কতিপয় অঞ্চলের নাম করা যাইতে পারে। এই বর্দ্ধিতায়তন বাঙ্গালা প্রদেশের কি নাম দেওয়া যাইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এই অংশের নাম "মহা-বঙ্গ"

রাখিলে ক্ষতি কি? বৃহত্তর বঙ্গ বা "মহা-বঙ্গ"ই প্রাচ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও উন্নত অংশ। এমন এক শুভদিন আসিতে পারে যেদিন বাঙ্গালীর প্রচেষ্টার ফলে, বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনের ফলে, বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের ফলে সমগ্র পূর্ব্ব-ভারত বা "প্রাচ্যদেশ" "মহাবঙ্গ" নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে।

প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-পাকিস্থান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশকে সম্পূর্ণভাবে এবং ছোটনাগপুর বিভাগ ও উড়িষ্যা প্রদেশকে আংশিকভাবে লইয়া "মহাবঙ্গ" গঠন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরে এই ভূভাগের একটি বৃহৎ অংশ আদিম অনার্য্য বা অনুন্নতজাতি অধ্যুষিত। এই অংশ বাদ দিলে আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকা নামক দুইটি উন্নত ও সুসভ্য অঞ্চল পূর্ব্বদিকে অবশিষ্ট থাকে। সুরমা উপত্যকা নিয়া কোন গোলযোগ দেখা যায় না, কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাদের দেশকে বাঙ্গালার সহিতই সংযুক্ত করিতে চাহেন এবং নিজেরাও বাঙ্গালা ভাষাভাষী। একমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিগণের কিয়দংশ তাহাদের অঞ্চলকে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ তাহারাও একপ্রকার বাঙ্গালা ভাষাভাষী। এমতাবস্থায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কিছুটা অঞ্চল ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবার যে অর্থনৈতিক যোগ্যতা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য থাকা আবশ্যক তাহা ইহাদের মধ্যে আছে কি? এই অংশ এবং উড়িষ্যা প্রদেশের কতকটা অংশ এই সব কারণে বাঙ্গলার সহিতই সংযুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। ছোটনাগপুরের কতকটা

অংশেতো বাঙ্গালীগণ ইতঃপূর্ব্বেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে এবং অপরাংশও বাঙ্গালীগণের প্রচেষ্টায় উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই অংশের আদিম ও অনার্য্য মুণ্ডারী জাতীয় অধিবাসিগণ বাঙ্গালীর নির্দ্দেশেরই অধিক পক্ষপাতী মনে করা যাইতে পারে।

এই "মহাবঙ্গ" প্রদেশ খনিজ ও কৃষি-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। বর্তমান যুগে কোন জাতির সভ্যতার উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কৃষি ও খনিজসম্পদ অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া এই প্রদেশে প্রচুর বনজ ও জলজ সম্পদও রহিয়াছে। এই দেশ প্রধানতঃ নদীমাতৃক এবং গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ এই দেশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নদ-নদী। এই দেশ অসংখ্য নদ-নদী ও খালবিলপূর্ণ থাকার জন্য ইহা কৃষি ও মৎস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে। কৃষিসম্পদের মধ্যে ধান্য, চা ও পাটের নাম করা যাইতে পারে। পাট-তো বাঙ্গালার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। নানাপ্রকার খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, অভ্র, লৌহ ও পেট্রোলিয়মের বিশেষ স্থান রহিয়াছে।

এই বৃহত্তর বঙ্গ বা "মহাবঙ্গ" প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রদেশ এবং ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে বাঙ্গালীগণই শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অপরাপর অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিক অগ্রণী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "প্রাচ্য" ও "মহাবঙ্গ" এই উভয় অংশই বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ ভারতের প্রদেশ হিসাবে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত হইত এবং বাঙ্গালীগণ বরাবরই এই অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। "মহাবঙ্গ" কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃটিশ ভারতের একটি সামরিক জেলা (Bengal & Assam District) বলিয়া গণ্য হইত।

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "কথা" নামক গল্পগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি এখনও ভালরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কথা-সাহিত্য নিয়া কিছু মূল্যবান আলোচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই বিষয় নিয়া আর বিশেষ কিছু আলোচনা হয় নাই।

এক কথায় বলিতে গেলে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ ভাগই কথাসাহিত্য। মধ্যযুগ বলিতে আমর ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী বুঝিয়া থাকি। এই যুগের সাহিত্য মোটের উপর তিন প্রকার, যথা:—লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব। ইহার মধ্যে প্রথম দুই ভাগই অর্থাৎ বৈষ্ণব ছাড়া আর দুই ভাগই বিস্তৃত অর্থে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কথাসাহিত্যের মূল উপাদান গল্প। এই গল্প হয় গীত হইত নতুবা সাধারণভাবে বর্ণিত হইত। সুতরাং ছড়া অথবা সংস্কৃত চম্পু কাব্যের ন্যায় দুইএরই সংমিশ্রণে এই গল্পগুলিকে পাওয়া যাইত এবং এখনও পাওয়া গিয়া থাকে। যদি তাহাই হয় তবে কথাসাহিত্যের মালঞ্চমালা বা ফকিরচাঁদ যেমন গল্প—গোপীচাঁদের গান, শিবায়ন বা চণ্ডীমঙ্গলও তেমন গল্প। মঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ ব্রতকথা এবং ব্রতকথা কথাসাহিতের একটী বিশেষ অংশমাত্র। অনুবাদশাখার রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতও গল্প ভিন্ন আর কি? আমরা শেষোক্তগুলিকে আমাদের

বর্ণিত পর্য্যায় হইতে বাদ দিতেছি কারণ এইগুলি সংস্কৃত হইতে নেওয়া ও বিশেষ সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া। তবে ইহার উপাখ্যানভাগও গল্পের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের গ্রাম্য নাট্য-সাহিত্যকে (যাহা যাত্রাগান বলিয়া পরিচিত) কথকতা ও কীর্ত্তন মালমসলা জোগাইয়াছে। অপরপক্ষে গোপীচাঁদের গান পাল রাজাদের আমলে প্রসার লাভ করিলেও ইহাও এই জাতীয়। গোরক্ষ-বিজয় বা মহীপালের গান রাজকীয় সমাদরে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াও হিন্দু আদর্শ হইতে অনেকাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়া ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বের গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। এই গানগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাইয়া কথাসাহিত্য হইতে দূরে পড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ সার্ব্বজনীনতার অভাব। এক দিকে যেমন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি কথাসাহিত্য হইতে বাদ দিতেছি, অপর দিকে তেমন পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা নামক গীতিকাগুলিকে এই সাহিত্যের মধ্যে ধরিয়া লইতেছি। ইহার কারণ এই গীতিকাগুলিতে গল্পাংশই প্রধান ও নামেতেই বুঝা যাইতেছে, ইহা গীত হইয়া থাকে। গীতিকাগুলির অনেকগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয় এবং গীতকথার সহিত পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মঙ্গলকাব্যগুলির সহিত এই বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য পালন করে না—অর্থাৎ ইহা দেবতাপ্রধান নহে। উপরন্তু কথাসাহিত্যের অনেক গল্পের অলৌকিকত্বও ইহাতে নাই। তথাপি মোটামুটি ইহা কথাসাহিত্যের অনেকটা কাছাকাছি বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্য বলিতে মঙ্গলকাব্য

শিবায়ন, গোপীচাঁদের গান, ময়মনসিংহ গীতিকা, অনুবাদ-সাহিত্য, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি বাদ দিয়াই ধরিতেছি। বৈষ্ণব-সাহিত্যকেও ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই, কারণ তাহার আদর্শ কথাসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কথাসাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও ইহার সম্বন্ধ আছে। "কথা" "আখ্যায়িকা" বা "উপাখ্যান" সংস্কৃতসাহিত্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। পৈশাচীভাষায় লিখিত "বৃহৎ-কথা" খুব প্রাচীন গ্রন্থ ও অধুনা লুপ্ত! তাহার পরবর্ত্তী "কথা-সরিৎ-সাগর", "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশ" বাঙ্গালা উপকথার প্রধান আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত পুরাণাদির উপাখ্যানভাগ ও বৌদ্ধ "জাতক" প্রভৃতির আদর্শও আমাদের কথাসাহিত্যের ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমাদের কথাসাহিত্যেরও স্থানবিশেষে বিভিন্ন নাম আছে। যথা, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের "কেচ্ছা" (ইহা মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত) ও ঢাকা অঞ্চলের "শাস্তর" সবই উপকথার নামান্তর। অনার্য্য সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতির গল্পগুলিও কতটা বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়। মুস্‌লিমদের ও পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের গল্পধারা বাঙ্গালা গল্পে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গল্পগুলিই এই জাতিদ্বয়ের গল্পগুলিকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ যে আরব ও পারশ্য দেশের মুসলমানি ভাষায় অনূদিত হইয়া তদ্দেশগুলির ভাবধারাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহাদের পৈতৃক গল্পগুলি মুসলমানি গল্পগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া

গিয়াছে। পাশ্চাত্য কেল্টিক্, গ্রীক্, টিউটনিক বা রোমক অনেক গল্পের সহিত সংস্কৃত তথা বাঙ্গালা গল্পের স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য হেতু অনেক সময়ে মনে হয়, ভারতীয় গল্পগুলিই বোধ হয় অনেক স্থলে তাহাদের উপাদান জোগাইয়াছে। কথাটিতে আংশিক সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভারতীয় সভ্যতা অধিকতর প্রাচীন হইতে পারে, ভারতীয় ও আরব বাণিজ্য য়ুরোপে অতি প্রাচীন কালে প্রসার লাভ করিতে পারে, ভারতীয় অথবা অন্যান্য প্রাচ্য বেদে জাতিসমূহের য়ুরোপ গমনের প্রমাণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই কি য়ুরোপীয় গল্পগুলির ভারতীয় গল্পগুলির কাছে বিশেষভাবে ঋণী হইতে হইবে? ভারতীয় ভস্মলোচন প্রভৃতি গল্পের মত গল্প অথবা পক্ষীরাজ ঘোড়া, কি রাজকন্যার কাহিনী কিম্বা রাজ-পুত্রাদির দেশ ভ্রমণ ও অসম্ভব কার্য্য সম্পাদন, সব দেশের গল্পের মধ্যেই থাকিতে পারে। চীন, জাপান, রুশ, ফরাসী, সুইডেন, স্পেন, জার্ম্মাণী, ভারত প্রভৃতি সব দেশেই এবিষয়ে ঐক্য আছে। ইহা মানবজাতির বোধ হয় সাধারণ সম্পত্তি। কোন জাতিবিশেষের বিশেষ অধিকার ইহাতে বেশী নাই। যে যে বিষয়ে বিশেষ অধিকার সূচিত করে তাহা—দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, রুচি প্রভৃতি হিসাবে বিভিন্নতার হেতু—পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐক্য থাকিলেই ঋণের প্রশ্ন উঠা উচিত নহে। মূলতঃ একভাব থাকিলেও দেশ, জাতি প্রভৃতি হিসাবে পরে নূতন নূতন গল্প সৃষ্টি হইয়া কালক্রমে এক দেশের গল্প অন্য দেশের গল্প হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই সঙ্গত মনে হয়।

কোন জাতির প্রাচীন সভ্যতার ও শিশুমনের প্রতীক এই

উপাখ্যানসমূহ। কোন্ সুদূর অতীতকালে, বৃক্ষতলে অথবা গৃহাভ্যন্তরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া কোন প্রাচীন ব্যক্তি তাহার যৌবনের দুঃসাহসের কর্ম্মের বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত হইত এবং তাহাই বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া শ্রবণ করিত তাহা কে বলিতে পারে ? এইরূপে কোন জাতির মধ্যে বহু গল্পের সৃষ্টি হইত, এবং শিশুমন তাহার উপর কত কল্পনারই না আরোপ করিত ! ইহার ফলে পক্ষীরাজ ঘোড়া, বেজান সহর, জলের নীচে পাখীর প্রাণের সহিত রাক্ষসীর প্রাণের সংযোগ, মেঘবরণ কেশের অধিকারিণী কেশবতী রাজকন্যা, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, শুকপক্ষী, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী, সদাগর, ময়ুরপঙ্ক্ষী নাও, মন-পবনের নাও, জীয়ন-কাঠি—মরণ-কাঠি, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত নরবলি প্রভৃতি কত কথার সংবাদই না আমরা পাইয়া থাকি। যাহা হউক প্রত্যেক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য এই সব গল্প হইতে ধরা পড়ে। প্রত্যেক জাতির শিশুমন এই সব গল্প শুনিয়াই কল্পনাকে জাগ্রৎ করে ও নিজের ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লয়। যে জাতি সভ্যতার যত ঊর্দ্ধে উঠে, সেই জাতির গল্পগুলিও ততই মনোরম হইয়া থাকে। অবশ্য এই বিষয়ে অন্যমতও আছে।

এই গল্পগুলিকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—

রূপকথা, ব্রতকথা, গীতিকথা ও ব্যঙ্গকথা। এই চারি প্রকার গল্পের মধ্যে রূপকথা উপকথা হিসাবে যথেষ্ট প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কাহিনীর খোঁজ আমরা ইহাদের মধ্যে পাইয়া থাকি। প্রথম গল্পগুলি বোধ হয় রূপকথা হিসাবেই প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। নৈতিক উদ্দেশ্যও

এই কাহিনীগুলির একটি প্রধান অঙ্গ বলা যাইতে পারে। রাক্ষস-রাক্ষসী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, কোটালপুত্র প্রভৃতির বিবরণ এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। শীত-বসন্ত বা বিজয়-বসন্ত, সখী-সোনা, বাইশ জোয়ান—তেইশ জোয়ান প্রভৃতি গল্প এই বিভাগের অন্তর্গত। এতদ্দেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাবেও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে অর্থাৎ ১৫শ—১৬শ শতাব্দীতে সীতা, সাবিত্রী, নলরাজা প্রভৃতির কাহিনী এই গল্পগুলিকে কোনঠাসা করিয়াছে এইরূপ একটি মত থাকিলেও আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। এই গল্পগুলি বরাবরই এইদেশে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নগর হইতে গল্পগুলি কতকাংশে নির্ব্বাসিত হইলেও পল্লীগ্রামে সমান আদরই লাভ করিতেছে ইহা অস্বীকার করিবার হেতু নাই।

ব্রতকথাগুলি রূপকথা হইতে এক হিসাবে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের। এই কথাগুলি প্রথমতঃ এদেশে মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত ও তাহাদের জন্যই গল্পগুলির সৃষ্টি। মেয়েরা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখের ভার নিবার ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রতগুলি পালন করে। তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে বিবাহিত জীবনের কর্ম্মপন্থা প্রভৃতি এই ব্রতগুলির প্রার্থনার ভিতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ধন-জন-পুত্র লাভ করিয়া জন্মায়তি থাকিবার জন্য বালিকা বয়স হইতেই তাহাদের ব্রত পালন করিবার কতই না আকাঙ্ক্ষা, কতই না সহিষ্ণুতা! দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ব্রত যথা—থুয়া, লাউল প্রভৃতির ভাষা এখনও কতকাংশে বেশ দুর্ব্বোধ্য আছে। ইহাদের এইরূপ ভাষা দৃষ্টে মনে হয়, এই সব দেবতা হয়তো অনার্য্যগণ হইতে

বাঙ্গালার মেয়েরা পাইয়াছে। অতি প্রাচীন দুরূহ ভাষা এখনও ব্রতসমূহের কথার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং ভাষার দিক দিয়া ব্রতগুলি মূল্যবান। তৃতীয়তঃ, যে সব চিত্র ব্রত উপলক্ষে মেয়েরা পিঠালি গুলিয়া অঙ্কিত করে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এখন আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্যদের প্রাচীন যজ্ঞভূমির বিভিন্ন আকার হইতে যেমন ভবিষ্যতে এতদ্দেশে জ্যামিতি-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল তদ্রূপ হয়ত বাঙ্গালী মেয়েদের অঙ্কিত এই চিত্রগুলি হইতে কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। চিত্রকলার দিক দিয়া এগুলির যে বিশেষ মূল্য আছে তাহা নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ প্রাচীন ভারতের লুপ্ত অক্ষরমালার সন্ধান এই চিত্রগুলি হইতে পাইতেছেন। ইহা আমাদের মেয়েদের কম গৌরবের কথা নহে। চতুর্থতঃ, নীতি-প্রচারের দিক দিয়া এই ব্রতগুলির বিশেষ মূল্য আছে। সমাজের নৈতিক আদর্শ মেয়েদের এই ব্রতগুলিতে বিশেষ পরিস্ফুট আছে। রূপকথাতে ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু এই ব্রতকথাগুলিতে তাহা সোজাসুজি সরলভাবে বলা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, ব্রতকথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য অপরাপর কথাগুলি হইতে অনেক বেশী। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা প্রভৃতির ব্রতকথাই কালক্রমে মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যের জন্মদান করিয়াছে। এই সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব নানা কারণে ব্রত কথাগুলির আদর শিক্ষিত সমাজে খুব বেশী। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ব্রতকথার অন্তর্গত কতকগুলি ছড়ার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত দুই প্রকার কথা ভিন্ন আর এক রকম কথা আছে তাহা গীতিকথা। গীতিকথাগুলি গান গাহিয়া বলা

হইত। ইহা নামেতেই বুঝা যাইতেছে। সময় সময় গানের মধ্যে গদ্যও থাকিত। এই গল্পগুলি সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। গল্পগুলি কতকটা গোপীচন্দ্রের গানের মত। এই গল্পগুলিতে সদাগর ও বাণিজ্য-যাত্রার কথা এত বেশী আছে যে, বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাষার দিকেও স্বল্প কথায় বর্ণনা-মাধুর্য্য এই গীতিকথাগুলিতে খুব বেশী আছে। উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শ সংস্থাপনের চেষ্টা এই গীতিকথাগুলিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধপ্রভাবে সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল ও প্রাচীন বৌদ্ধ অথবা হিন্দুগণ কিরূপভাবে জলযাত্রা করিত ও রাজ্য শাসন করিত, তাহার একটি সুস্পষ্ট চিত্র এই গীতিকথাগুলিতে আছে। গান গাহিয়া গল্পগুলির বর্ণনীয় বিষয় বুঝান হইত বলিয়া, ইহা এক সময়ে সর্ব্বসাধারণের নিকট খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় কাঞ্চন-মালা, মালঞ্চ-মালা প্রভৃতি কতিপয় গীতিকথা আবিষ্কার ও লিপিবদ্ধ করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে স্বর্গীয় লালবিহারী দে মহাশয়ের প্রথম শ্রেণীর রূপকথা সংগ্রহের কথাও উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে ব্যঙ্গকথা সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। এই জাতীয় গল্প গান নহে এবং ইহা বিশেষ কোন নৈতিক আদর্শও স্থাপন করে নাই। বিদ্রূপ করাই ইহার মূল কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এতকাল সাহিত্যে ব্যঙ্গের স্থান বিশেষ উচ্চে ছিল না—এখন হইয়াছে। ভাঁড়ামি ও সূক্ষ্ম রসরচনার পার্থক্য পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী বুঝিত না। সেইজন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের এত

আদর। ভাঁড়ামো অতি নিম্নশ্রেণীর ব্যঙ্গের মধ্যে গণ্য এবং কতিপয় বঙ্গদেশীয় গ্রাম এই ভাঁড়ামোর জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নামও এই বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা শুভকথা নহে। উচ্চশ্রেণীর রস-রচনা সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করে, নিম্নশ্রেণীর রসিকতা তাহা করে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-রচনা অল্পই আছে। যাহা হউক আমাদের প্রাচীন ব্যঙ্গ-কথাগুলি মারাত্মক রকমের ভাঁড়ামোতে পূর্ণ নহে। স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের রসিকতাও আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও এইরূপ উচ্চ ও নীচ মিশ্র রসিকতা পাওয়া যায়। ব্যঙ্গকথার রসিকতা কতকটা শিশুর হাসির ন্যায় নির্ম্মল ও কতকটা আবিলতাপূর্ণ। প্রাচীন ব্যঙ্গকথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হবুচন্দ্র রাজা ও তাহার মন্ত্রী গবুচন্দ্রের গল্প। ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গল্পটি ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে রচিত।

ইহাই আমাদের কথাসাহিত্যের মোটামুটি বিবরণ। এই সব গল্পে পশুপক্ষী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মানুষের মত বুদ্ধি রাখে ও মানুষের মত কথা কহিতে পারে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বল্প কথায়, নানারূপ বর্ণনা গল্পগুলিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমানদের আরব্যোপন্যাসেও পশুপক্ষী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু, অনেকগুলি গল্প মূলতঃ ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের নিকট হইতে পাইলেও ইহাদের মধ্যে এত কৌশলপূর্ণ বর্ণনা নাই এবং ইহা মোটের উপর উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শ বর্জ্জিত। স্ত্রীজাতির প্রতি নিকৃষ্ট মনোভাব আরব্যোপন্যাসের একটি

বৈশিষ্ট্য। তবে জীন, দৈত্য প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় রাক্ষস-রাক্ষসীর গল্প অপেক্ষা গাঢ়তরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আরব্যোপন্যাসে নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা পাশবিক আদর্শ, সমর্থিত না হইলেও, অনেক স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। য়ুরোপীয় গল্পগুলিতে দৈহিক বলের প্রাধান্যই বেশী দেখা যায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় এমন তথ্যপূর্ণ গল্পও য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যে আছে। অলৌকিকত্বে সবদেশের গল্পই তুল্য। পশুপক্ষীর মনুষ্যের স্বরলাভ বা বুদ্ধি প্রদর্শন বা রূপান্তর গ্রহণ সর্ব্বদেশীয় গল্পেই আছে। বৌদ্ধ, চীনা ও জাপানী গল্পগুলিও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটী দেশও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ভারতীয় গল্পগুলিও কিছু কিছু রূপান্তরিত ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বদেশীয় গল্পে যে এই সার্ব্বজনীন গুণ নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে অথবা কোন মূল উৎস থাকিতে পারে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা হউক এতদ্দেশীয় গল্পগুলির সার্ব্বজনীনত্ব, উচ্চাদর্শ ও উচ্চমনস্তত্ত্ব চিরকাল জগতের বিস্ময় আকর্ষণ করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নাথ ধর্ম্ম

নাথধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই নাথধর্ম্ম 'নাথ' উপাধি বিশিষ্ট যুগীজাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালস্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম দারুণ ব্যাধির ন্যায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে যুগে শৈব হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই ঘোর ধর্ম্মকলহের দিনে (১০ম-১১শ শতাব্দীতে) নাথধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া কলহপরায়ণ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া শান্তিবারি সেচনে প্রয়াসী হইয়াছিল। অধুনা নাথধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইলেও এবং যুগীজাতি সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিলেও এমন এক দিন গিয়াছে যখন নাথধর্ম্ম ও যুগীজাতি ভারতে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান। আলোচ্যধর্ম্মকে "নাথধর্ম্ম" বলে কেন ইহা এক কঠিন প্রশ্ন। সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ সকলেরই "নাথ" উপাধি ছিল বলিয়া ইহার নাম নাথধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। এই নেতাগণ "সিদ্ধাই" বা "সিদ্ধ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধাইগণের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই নাথধর্ম্মীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সিদ্ধাইদিগের মধ্যে যে চারিজন সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কালুপা ও হাড়িপা। এই চারিজনের মধ্যে গোরক্ষনাথের

ভক্তের সংখ্যাই অধিক। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কালুপা হাড়িপার শিষ্য ছিলেন।

নাথধর্ম্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের মধ্যে মিলনপ্রয়াসী হইয়াছিল বলিয়া উভয় ধর্ম্মের সারাংশ নিজ অঙ্গভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শূন্যবাদ ও অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতিসমূহের অন্যতম। নাথধর্ম্মেও ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। ডোম ও হাড়ি প্রভৃতি নীচজাতিসমূহের পূজিত যে ধর্ম্মদেবতার পূজা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্যযুক্ত সেই ধর্ম্মপূজামন্ত্রের এক চরণ "ভক্তানাং কামপুরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং" [১]। ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির অপর একস্থলে আছে "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে" [২]। এই শূন্যমূর্ত্তি যজ্ঞ-বিরোধি ধর্ম্মের পূজক নাথধর্ম্মাবলম্বিনী রাজমাতা ময়নামতী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন "জীও জীও রাঁড়ীর বেটা ধর্ম্মে দেউক বর"। অপর একস্থলে আছে, "হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংসা পরমধর্ম্ম যারপর নাই" [৩]॥ হাড়িপার নিম্নলিখিত উক্তি বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকতা ও শূন্যবাদে পূর্ণ।

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি॥
আপনি জলস্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ॥" [৪]

ধর্ম্মপূজাপ্রসঙ্গে মহাজ্ঞানলাভের কথা বারংবার উল্লেখ আছে। এই মহাজ্ঞান কি তাহা বলা কঠিন। ইহা সম্ভবতঃ নির্ব্বাণতত্ত্ব। এই জ্ঞানলাভ নাথধর্ম্মীদিগেরও পরম সাধনার

১ ও ২ রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি।
৩। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান, দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত।
৪। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান, দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত।

ধন। হাড়িপা, কালুপা প্রভৃতি নাথ আচার্য্যগণ সকলেই "জ্ঞানী" ছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতা ময়নামতীকে ভয়ানক অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন, "হাড়ির খাইছেন গুয়া মা হাড়ির খাইছেন পান। ভাব করে শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গিয়ান [১] ॥"

নাথধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। নাথধর্ম্মে শিবের কথা ভক্তিসহকারে উল্লিখিত আছে। এই শিব বৈদিকযুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব নহেন। ইনি ইঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক কম ক্ষমতাশালী এবং ধর্ম্মদেবতার আজ্ঞাধীন। শিব সিদ্ধাইদিগের নমস্য হইলেও তাঁহাদিগের মহাজ্ঞান-প্রভাবে সর্ব্বদা কম্পিত-কলেবর। মহাজ্ঞানপ্রাপ্তা ময়নামতীকে মহাদেব এত ভয় করিতেন যে বলিতেছেন, "মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর। কৈলাসভুবন মোর কৈর্ব্বে লণ্ডভণ্ড ॥" [২]

এই মহাজ্ঞান মীননাথ প্রথমে মহাদেবের মুখেই শুনিতে পান। মহাদেব গৌরীকে গোপনে মহাজ্ঞান উপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময় মীননাথ—

"মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টাঙ্গির লামাতে রহে বোগাল স্নুন্দর ॥" [৩]

হিন্দুর দেবতা-ব্রাহ্মণ নাথপন্থিগণ মানিলেও ইহাদিগের স্থান মহাজ্ঞানপ্রাপ্ত সিদ্ধাইগণের অনেক নিম্নে। যখন গোরক্ষ-নাথ মীননাথের আয়ুষ্কাল জানিতে যমপুরীতে গিয়াছিলেন তখন, "গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে। জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥" [৪] এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

১। ময়নামতীর গান। ২। মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
৩। গোরক্ষবিজয়। ৪। গোরক্ষবিজয়।

মহাযান বৌদ্ধ এবং নাথ যোগী ইঁহারা উভয়েই মন্ত্রশক্তি এবং গুরুতে আস্থাবান্ ছিলেন। হাড়ি সিদ্ধাকে ইন্দ্রের পুত্র চামর ব্যজন করিতেন এবং চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার কুণ্ডল হইয়া কানে দুলিতেন এবং ময়নামতীর ভয়ে দেবকুল আড়ষ্ট ছিলেন। সুতরাং মন্ত্রশক্তি এখানে দিগ্বিজয়ী, এই মন্ত্রই "মহাজ্ঞান," এবং এই মন্ত্রদাতা গুরু। নেপালে এখনও বৌদ্ধদিগকে "গুভাজু" ও হিন্দুদিগকে "দেভাজু" বলে। "গুভাজু" অর্থ গুরুভজনশীল এবং "দেভাজু" অর্থ দেবতাভজনশীল।

প্রাচীন মনসামঙ্গল এমন কি চণ্ডীদাসের সহজ মতের ভিতরেও এই বৌদ্ধ ও নাথধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। চাঁদসদাগরের "মহাজ্ঞান" সেই প্রাচীন যুগের আমদানী ও চণ্ডীদাসের উক্তি "শুন হে মানুষ ভাই, সবার অধিক মানুষ বড়, তা'হতে অধিক নাই" দ্বারা মানুষ যে দেবতাদের অপেক্ষাও বড়, তাহাই সূচিত হইতেছে; তাহা না হইলে স্বর্গের দেবতাগণ ময়নাবুড়ীর সম্মার্জ্জনীর ভয়ে পলায়নপর হইবেন কেন?

মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কালুপা ও হাড়িপা এই চারিজন নাথপন্থিগণের প্রধান সিদ্ধাই। মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া হরগৌরীসংবাদ শ্রবণ করাতেই বোধ হয় ইহার এই নাম হইয়াছে। গোরক্ষনাথ নামটি উত্তর ভারতের অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথের অপর নাম জলন্ধরী। জলন্ধর নামে পঞ্চনদ প্রদেশের অংশ অনেকেরই সুপরিচিত। জলন্ধরী গোরক্ষনাথ অপরাপর সিদ্ধাইগণ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় দেখিয়া মনে হয় তিনি বঙ্গের বাহিরের কোন অঞ্চল হইতে এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। নেপালে মীননাথ

একরূপ শিবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তথায় গোরক্ষনাথের আদি বাসভূমি হওয়াও বিচিত্র নহে। হাড়িপা প্রকৃতপক্ষে হাড়ি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রাণী ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, "হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী"[১], এতদ্ভিন্ন গৌরীর হাড়িকে বরদান "চলি যাও হাড়িফা যে মৈনামতির ঘর। হাতে করি পিছা কান্ধে কোদাল লই।"[২]—ইত্যাদিতে হাড়িপা যে প্রকৃত হাড়ি নহে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। নাথ সিদ্ধাইগণ সকলেই কান চিরিয়া "কানকাটা" যোগী আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। কালুপা, কানুপা বা কানফা নামটি বোধ হয় কানকাটা যোগী-বোধক। মীনচেতনে আছে, "পূর্ব্বদিকে হাড়িফা গেল দক্ষিণে মীনাই। পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে কানাই॥" ইহাতে বোধ হইতেছে এই সিদ্ধাইগণ বাহির হইতে বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত সিদ্ধাইচতুষ্টয় সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের মত এই যে গোরক্ষনাথ, কালুপা প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের সাধুপুরুষ হইলেও শৈব ছিলেন। রঙ্গপুরের যোগিগণ নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত যোগিগণের শাখা কি না তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই। গোরক্ষনাথের আদি বাসস্থানও তিনি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মতে গোরক্ষনাথ ও তৎসম্প্রদায়স্থ যোগিগণ পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে ইহারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইহারা ঘোর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিরোধী। নেপাল হইতে আগত বৌদ্ধগণের পক্ষেই ইহা সম্ভবে। মাণিকচন্দ্র রাজার সময় যোগিগণ শৈবলক্ষণাক্রান্ত

১। গোবিন্দচন্দ্রের গান। ২। মীনচেতন

ছিলেন। তাহারা নেপালী যোগিগণের ন্যায় সিদ্ধপুরুষদিগের উপাসনা করিতেন। গোরক্ষনাথ অনেকাংশে শিবের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।[১]

শৈবদিগের যামাগামাশাখাভুক্ত কালুপাকে তিনি সিদ্ধাই-কালুপা মনে করেন।

গ্রিয়ারসনের মতে কানকাটা নাথযোগিগণের মাণিকচন্দ্র রাজা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক হইয়া পড়েন। মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কাড়দ্বারা রাজকর আদায় করার কথা আছে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাণিকচন্দ্রকে হিন্দু শাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করেন এবং গ্রিয়ারসন স্বীয় ভ্রম স্বীকার করেন। তিরুমলয়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।[২] তাহা হইলে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র সম্ভবতঃ একাদশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাইগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

নাথপন্থীদিগের ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গীতিপূর্ণ গ্রন্থাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও অমূল্যতথ্যে পূর্ণ।

১। গ্রিয়ারসন সম্পাদিত মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৫২—৫৩, ৬ষ্ঠ সং।

গোপীচন্দ্র

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র নামধেয় কোন রাজা এবং তদীয় মাতা ময়নামতীর কীর্ত্তিকাহিনী অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশে গীত হইত। এই গীত বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই গীত মুখে মুখে দীর্ঘকাল যাবৎ এই দেশে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন-স্থানে প্রাপ্ত ও নানা কবি লিখিত ইহার কতিপয় হস্ত লিখিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুকানান, গ্রীয়ারসন প্রমুখ সাহেব-গণ এবং শিবচন্দ্র শীল, দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি মহোদয়গণ বিভিন্ন আকারে প্রাপ্ত এই গাথা সম্পাদিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এই বাঙ্গালাপ্রধান গাথার প্রাপ্তিস্থল এবং ঘটনাস্থল। তবে ভারতের বিভিন্নস্থলে, যথা মহারাষ্ট্র দেশ, রাজপুতনা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে গোপীচাঁদের কাহিনী প্রচলিত আছে। সুতরাং সাহিত্যিক মূল্য ভিন্ন ঐতিহাসিক মূল্যও গাথাটির কম নহে। এই গাথার বিষয়বস্তুর সময় নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। এই বিষয়ে নানা জনের নানা মত। খৃঃ ৫ম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ ১৫শ শতক মধ্যে এই গাথার ঘটনাকাল বলিয়া দেখা যাইতেছে, কারণ সময়ঘটিত যাবতীয় মতানৈক্য সমস্তই এই সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর মধ্যে নিবদ্ধ। নাথপন্থী যুগী বা যোগী-

জাতির যে দুইখানি গাথা আছে গোপীচাঁদের কাহিনী তাহাদের অন্যতম। অপর গাথাখানির নাম মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়। গোপীচাঁদের গুরু হারিপা (হাড়িপা) এবং গোরক্ষনাথ হারিপার গুরু; এই সম্বন্ধে অনেকেই একমত।

এই গাথায় বর্ণিত রাজা গোপীচাঁদের কি ঐতিহাসিক সত্যতা আছে? থাকিলে তাহার সময়টি কি? এই বিষয়ে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) রাইট সাহেবের মতে গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব-কাল খৃঃ ৫ম শতক।

(খ) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে নাথপন্থীদের বঙ্গদেশে প্রভাবকাল ৯ম শতাব্দী। তাহা হইলে গোরক্ষনাথ ৫ম শতকের অনেক পরবর্ত্তী সময়ের লোক। একাধিক গোরক্ষনাথ থাকিলে তো আরও গোলযোগ।

(গ) সিলভ্যা লেভি সাহেবের মতানুসারে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

(ঘ) দলপত রামের মতে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব কাল খৃঃ ১৪শ কি ১৫শ শতক।

(ঙ) মারাঠী গ্রন্থ "জ্ঞানেশ্বরীর" মতে গোরক্ষনাথ ১২শ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

(চ) রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থানুসারে গোরক্ষনাথ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন।

এই তো গেল গোরক্ষনাথের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে। ইঁহাকে আমরা রাণী ময়নামতীর গুরু বলিয়া জানি; কিন্তু বুকানান সাহেবের মতে হারিপাই ময়নামতীর গুরু। বৌদ্ধ সিদ্ধা বালপাদ নাকি হাড়িপা বা হারিপার অন্যতম নাম। ইহার সম্বন্ধে তিব্বতীয় গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তৎ-

সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র দাস লিখিত, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশিত, প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

এই সিদ্ধান্বয় ভিন্ন রাজা মাণিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব কাল নিয়া যে বিষম মতদ্বৈধ আছে তাহা বিচারযোগ্য।

(ক) দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একাদশ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ তিরুমলয়ের শিলালিপিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

(খ) দুর্ল্লভ মল্লিক লিখিত গাথায় গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাই।

(গ) উড়িষ্যার গাথাতেও গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে।

(ঘ) সুকুর মামুদ ও ভবানী দাসের লিখিত গাথা দু'টীতে গোবিন্দচন্দ্র স্থলে "গোপীচন্দ্র" এই নামের উল্লেখ আছে বোধ হইতেছে গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র একই ব্যক্তি। একাধিক রাজা গোবিন্দচন্দ্র থাকাও অসম্ভব নহে।

(ঙ) পূর্ব্ববঙ্গের "চন্দ্র" রাজবংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজেন্দ্র চোলের সময় চন্দ্র-রাজগণের বংশলতা উল্লিখিত তাম্রশাসন অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া গেল :—

গোপচন্দ্র নামে একটি রাজার কথা বঙ্গদেশীয় তাম্রলিপিতে

আছে। তিনি খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। ডাঃ হর্ণলি এই গোপচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

দুর্ল্লভ মল্লিককৃত "গোবিন্দচন্দ্রের গীতে" আছে—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

"ধাড়ি" অর্থ প্রধান বা প্রথম ধরিয়া লইলে পূর্ণচন্দ্র ও ধাড়িচন্দ্র এক ব্যক্তি হইয়া পড়েন। তাহা হইলে চন্দ্ররাজগণ এবং গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায়।
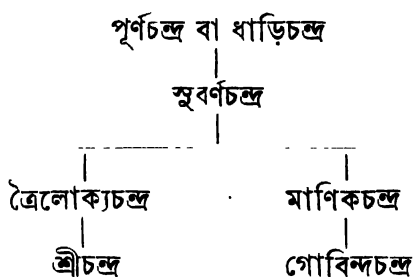
"শব্দ-প্রদীপ" রচয়িতা সুরেশ্বর স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন তিনি ভীম পাল নৃপতির রাজবৈদ্য এবং তৎপিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালদেবের সভাকবি ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ বাঙ্গলা দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-সভায় বৈদ্যগণাগ্রনী ছিলেন। সম্ভবতঃ সুরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং সুরেশ্বরের পিতামহ দেবগণ দশম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন ধরা যাইতে পারে। রামচরিতের ভূমিকায়ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই কথার সমর্থন করিয়াছেন।

তিরুমলয় শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র, "শব্দ-প্রদীপের"

গোবিন্দচন্দ্র এবং গোপীচন্দ্র গানের গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি কিনা ইহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। আজিও ইহার মীমাংসা হয় নাই।

গোপীচন্দ্রের শ্বশুর হরিচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

"গোপীচন্দ্রের শ্বশুর হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজা কোন স্থানের লোক ছিলেন তাহাও জানিবার উপায় নাই। দুর্ল্লভ মল্লিক ইঁহার বাসস্থান কাঞ্চনীনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ...মহারাষ্ট্রীয় গাথায় কিন্তু গোপীচন্দ্রের নিজের রাজধানী কাঞ্চননগর......রঙ্গপুর জেলায় ময়নামতীর কোটের অদূরে (ধর্ম্মপাল হইতে ৭।৮ মাইল ব্যবধানে) হরিশ্চন্দ্র-পাট বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটী বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ এখনও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। একটির মধ্যে রাজার সমাধি ছিল বলিয়া ডাঃ গ্রীয়ারসন উল্লেখ করিয়াছেন।......ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে হরিশ্চন্দ্র নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের যে সংস্কৃত লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সময়ের সহিত গোপীচন্দ্রের সময়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের যে বংশ পরিচয় আছে তাহাতে তাঁহাকে গন্ধবণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।" (ভূমিকা, গোপীচন্দ্রে গান ২য় খণ্ড) হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যার নাম অদুনা ও পদুনা। গোবিন্দচন্দ্রের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহাদের ছাড়া ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ অন্য রাণীদেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অন্য গাথায় তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র জাতিতে কি ছিলেন ? ইহাও একটি সমস্যা বটে। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে।

"ইহারা জাতিতে ক্ষেত্রীকুলের বেনিয়া।
বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল হেলাতে হারামু।"

মনসামঙ্গলের চাঁদ বেনে (চন্দ্রধর) গোপীচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। মানিকচন্দ্র রাজার গানে চাঁদসদাগরের উল্লেখ আছে। এই গানের আর এক স্থানে আছে "বড় ভাই আছে মোর মাদাই তাম্বরী।" মাধবচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই হইবেন। কারণ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার সম্ভব হয় না।

উল্লিখিত উদাহরণসমূহে ক্ষেত্রিকুলের বণিকত্ব সূচিত হইতেছে। স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় গোপীচন্দ্রকে ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় জাত্যংশে ইহাদিগকে রাজবংশী স্থির করিয়াছেন। সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র রাজার পরিচয় স্থলে পাই "কুলে শীলে ছিল রাজা গন্ধের বণিক।" খুব সম্ভব মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র গন্ধবণিক জাতীয় ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের পালরাজগণের সহিত তাঁহাদের রাজনৈতিক সংশ্রব ছিল। কিন্তু বুকানন, গ্রীয়ারসন ও গ্লেজিয়ার প্রমুখ সাহেবগণ পাল-বংশের সহিত এই চন্দ্রবংশের রক্তসম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতা। এই কথা নানাকারণে সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আর একটি কথা। যোগী জাতির ধর্ম্ম ও সামাজিক তথ্যপূর্ণ গাথা গন্ধবণিক জাতীয় মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনীতে পূর্ণ থাকিবে কেন বুঝা গেল না। এই রাজবংশও যোগী জাতীয় হইলেই যেন ছিল ভাল। আপাততঃ

বিশেষ প্রমাণ অভাবে গোবিন্দচন্দ্রকে গন্ধবণিক জাতীয় এবং তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃঃ একাদশ শতাব্দী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া গেল।

মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্ররাজার রাজত্ব ও বাসস্থানের চিহ্ন উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় ও পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় দেখা যায়। ভবানী দাস লিখিয়াছেন :

"আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর।" উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি স্থকুর মামুদের মতেও গোপীচন্দ্র "মৃকুল" বা মেহারকুলের রাজা ছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিকের মতে গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজধানীর নাম "পটিকানগর"। এই পটিকানগর কোথায় ছিল তাহার বিবরণ তিনি দেন নাই। এদিকে রংপুরে "ময়নামতীর কোট", "পাটকাপাড়", "হরিশ্চন্দ্র-পাট" প্রভৃতি স্থান এখনও আছে। "ময়নামতীর কোট" ও ফেরুসা নগর এক হওয়াও অসম্ভব নহে। এই "কোটের" সন্নিকটে হারিপার বাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত হয়। হীরা নটীর স্থানও এতদঞ্চলেই (পার্ব্বতীপুর রেল ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ খোলাহাটী) বলিয়া কথিত হয়। রংপুর জেলার "পাটওয়ারী" নামক স্থান "গোপীচন্দ্রের পাট" বলিয়া খ্যাত আছে। এই অঞ্চলে "উত্‌না পুদনা" নামক দু'টী বিল বর্ত্তমান আছে। এই তো গেল রংপুরের সহিত গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্ব-সংশ্রবের কথা।

আবার ত্রিপুরা জেলাতেও গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব ও রাজধানী ছিল বলিয়া দেখা যায়।

কবি ভবানীদাস ও স্থকুর মামুদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ে (লালমাই পাহাড়ের অংশ) গোপীচন্দ্রের প্রধান রাজধানী অবস্থিত ছিল। অতুনামুড়া,

পত্নামুড়া এবং গোরক্ষনাথ, হারিপা, গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর স্মৃতিবিজড়িত কতিপয় স্থান এখানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এক সময়ে যুগীজাতির যে এখানে বিলক্ষণ প্রভাব ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও এখানে পাওয়া যায়। মেহেরকুল ও পাটিকারা নামক পরগণা দুইটী পাশাপাশি অবস্থায় ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। মেহেরকুলে যে গোপীচন্দ্রের বাড়ী ছিল স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। গোপীচাঁদের বাসস্থান সম্বন্ধে ভবানীদাসের গানে আছে :

"বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৌড়র সহর। দাদার মিরাশ এড়ি জাবে কমলানগর। তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকানগর। আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর।" বাপের মিরাশ ও দাদার মিরাশ বুঝিতে কষ্ট হইলেও সমস্ত গাথা ও কিংবদন্তি আলোচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে ত্রিপুরাতে গোবিন্দচন্দ্রের প্রধান রাজধানী ছিল এবং রংপুর অঞ্চলেও রাজত্ব বা জমিদারি বর্ত্তমান ছিল। কোন কোন কবি গোপীচাঁদকে ক্ষুদ্র রাজা বলিয়া বর্ণনা করিলেও তিনি যে উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি ও মতবাদের উল্লেখ করিলাম। এখনও স্থির সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করি না। নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান হইলে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে।

(ক) রাজা মাণিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব প্রকৃত কত বড় ছিল এবং এই উপলক্ষে স্থানগুলির ভৌগোলিক নির্দ্দেশ।

(খ) গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ এক ব্যক্তি হইলেও গোবিন্দচন্দ্র একাধিক ছিলেন কি না?

(গ) অদুনা ও পদুনার পিতা হরিচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি কিনা? অথবা একাধিক হরিশ্চন্দ্র ছিলেন কি?

(ঘ) গোবিন্দচন্দ্রের বংশ প্রকৃত কি জাতি ছিল?

(ঙ) চন্দ্র বংশের, পাল বংশের ও সেন বংশের প্রামাণিক বিবরণ।

(চ) নাথপন্থিগণের সিদ্ধাদিগের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ।

(ছ) বাঙ্গালার বাহিরে গোপীচাঁদের কাহিনী অথবা সিদ্ধাগণের বিবরণ সংগ্রহ ও বাঙ্গালার গাথাসমূহের বিবরণের সহিত তুলনামূলক গবেষণা।

(জ) এই অন্ধকার যুগের বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ ও রাজশাসনের একটি সঠিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা।

এই ভাবে আলোচনা ও অনুসন্ধান হইলে বাঙ্গালার রাজ-নৈতিক ও সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন আলোকপাত হইবে এবং অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া তুলিবে। গাথাসমূহে উল্লিখিত স্থানসমূহ সুধীবর্গের উচিত স্বচক্ষে দেখিয়া ও পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া এই ইতিহাসের তথা বাঙ্গালার ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ কবা; নতুবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অন্ধানুকরণ করিয়া কোন বিশেষ ফললাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

———

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য মধ্যযুগের বাঙ্গাল্লা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে রচিত হইয়াছিল। যে সময়ে এই সাহিত্যে অনাড়ম্বর, সহজ সরল গ্রাম্যভাব ও ভাষার মধ্যে অলঙ্কারবহুল সংস্কৃতের ছায়াপাত সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, ইহা সেই ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। এই মঙ্গল কাব্যখানিতে সংস্কৃতপূর্ব্ব যুগ ও সংস্কৃত যুগ এই উভয় যুগেরই স্পর্শ ও ইঙ্গিত প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চণ্ডীকাব্যকে বিষয়বস্তু করিয়া অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা প্রায় সকলেই জানেন, এবং এই সকল রচনার মধ্যে কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীকাব্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাও বোধ হয় আজ আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই সকল বিভিন্ন চণ্ডীকাব্য লইয়া ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যখানিকে আশ্রয় করিয়া অনেক কিছু মতামত এবং সমালোচনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্বন্ধে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

মুকুন্দরামের স্বলিখিত পুথিখানি এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে কবিকঙ্কণ-স্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরে রক্ষিত পুথিখানিই তাঁহার নিজের হাতে লেখা। আবার কেহ কেহ মনে করেন কবির প্রতিপালক আরড়া-ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি বাঁকুড়া রায়ের বাড়ীতে কবির যে পুথিখানি আছে উহাই সেই পুথি।

কাহারও মতে কবির নিজ গৃহের পুথিখানি তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নহে ইহা নিশ্চিত। তবে বড় জোর তিনি এই পুথিখানি আর কোন ব্যক্তিদ্বারা লেখাইয়া লইয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে উহা স্বহস্তে সংশোধন করিয়াছিলেন এই মাত্র। এই যুক্তিগুলির কোনও একটি গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ। অনেকের মতে কবির নিজহাতে লেখা আসল পুথিখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। এই মতই বোধ হয় ঠিক। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনেক সংস্করণ ছাপা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঠান্তরের অভাব নাই এবং কোন কোনটিতে অর্থহীন শব্দেরও প্রাচুর্য্য যথেষ্ট আছে। এমতাবস্থায় এখন কবির নিজের হাতে লেখা চণ্ডীকাব্যখানি খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানিতে নানা ধর্ম্মের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক চণ্ডীদেবী এই কাব্যের বিষয়ীভূতা হইলেও ইনি পৌরাণিক চণ্ডীদেবীর সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন। এই কাব্যের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ প্রভাব আছে বলিয়াও অনেকের ধারণা। বুদ্ধদেব ও ধর্ম্মদেবতা অভিন্ন বলিয়া একটি মত এতদ্দেশে চলিত আছে। মুসলমানগণ বাঙ্গালাদেশে আসিবার পূর্ব্বে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম এই দেশে তান্ত্রিক মত অবলম্বন করিয়াছিল ও ক্রমে ধর্ম্মদেবতার নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দুধর্ম্মের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার পথ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই প্রচলিত মত। অধুনা এই মতের বিরুদ্ধে আর একটি মত শুনা যাইতেছে। তাহা এই যে, ধর্ম্মদেবতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

দেবতা, ইনি বুদ্ধদেব মোটেই নহেন। এই ধর্ম্মদেবতার পূজার মধ্যে প্রতিপত্তিশালী বৌদ্ধধর্ম্মের কতকটা ছাপ পড়িয়াছিল মাত্র। কতকগুলি বড় ও ছোট ধর্ম্ম এক দেশে এক সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে পরস্পরের গুণ ও দোষ পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রবেশ করে, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই হেতু কোন একটি ধর্ম্মে অপর ধর্ম্মের কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইলেই দুইটিকে অভিন্ন কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। কোন্ মতটি যে ঠিক তাহা আমরা জানি না। ইহা লইয়া সম্যক আলোচনা হওয়া উচিত। যাহা হউক কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধদেব কতখানি প্রভাব স্থাপন করিয়াছেন তাহার নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। এই দুই দেবতা (যদি প্রকৃতপক্ষে দুই দেবতাই হন) ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মেরও কিছু কিছু চিহ্ন এই কাব্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে হনুমানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রেতাযুগের হনুমানকে দিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ যত কিছু বলের কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন। রামায়ণে হনুমানকে ভক্তবীররূপে দেখি কিন্তু প্রাচীন মঙ্গল-কাব্য সাহিত্যে তাহাকে শুধু শারীরিক বলের আদর্শ রূপে দেখিতে পাই। হনুমানের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া ভারতের কোন অতীত যুগের বানর পূজার কথা মনে পড়ে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত আলোচনার যোগ্য। হনুমান ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মার নাম ও তৎপুত্র দারুব্রহ্মার নামও এই কাব্যে পাওয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মা-পূজা এখনও এই দেশে প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন বহু পৌরাণিক দেবদেবীর নাম এই কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্য পাঠে বাঙ্গালার অতীত যুগের বিভিন্ন ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতের বেশ একটি চিত্র নয়ন সমক্ষে পরিস্ফুট

হইয়া উঠে, এই বিষয় প্রণিধানযোগ্য। স্বয়ং কবি মুকুন্দরাম কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন ইহা লইয়াও কথা উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ যখন চণ্ডীকাব্য লিখিয়া শাক্তদিগের দেবীর গুণকীর্ত্তন মুখ্যতঃ করিয়াছেন ও স্বগৃহে তাঁহার বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন তখন তিনি যে শাক্ত ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের হেতু দেখা যায় না। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখাইলেও তাহা গৌণভাবেই দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে অপরাপর অনেক দেবতার নাম উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। হিন্দুধর্ম্মে ইহাতে কোনও বাধা নাই, সুতরাং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব প্রীতি বা অপর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিলেই কবিকে সেই সব ধর্ম্মের কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই কাব্যখানিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় এই মাত্র। এই বিষয়টিরও চূড়ান্ত মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই, সুতরাং ইহাও বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

চণ্ডীকাব্যে বর্ণিত স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। কলিঙ্গ ও গুজরাট চণ্ডীকাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে এবং উজানি, গৌড় ও সিংহল ধনপতি উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উজানি ও গৌড় বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে কোন গোল নাই। সিংহল বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত হইলেও ইহা লইয়া কোন গোলযোগ ঘটে নাই। শুধু গোলযোগ কলিঙ্গ ও গুজরাট লইয়া। "কলিঙ্গবন" নামে বঙ্গের উত্তর অঞ্চলে একটী ভূভাগ ছিল এবং গুর্জ্জর-প্রতীহারগণ কোনও সময়ে (অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই দুই কারণে

দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পূর্ব্বোত্তর ভাগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোত্তর ভাগের সুপ্রাচীন সাগর-মেখলা গুজরাটদেশ কবির অজ্ঞাত ছিল বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস আছে। আবার কাহারও কাহারও মতে গুর্জ্জর-প্রতীহারগণের নাম হইতে কলিঙ্গ দেশের একাংশ কবি-বর্ণিত গুজরাট হইয়া থাকিবে! এই দুইটি স্থান বাঙ্গালার বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া যত প্রসিদ্ধিই লাভ করুক না কেন, বাঙ্গালার অন্তর্গত অথবা নিকটবর্ত্তী নগণ্য দুইটি স্থান এই দুই নামের সংশ্রবে পাইলে আমাদের বুঝিতে হইবে কবি তাহাই ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান দুটিকে তিনি কল্পনাও করেন নাই। এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? কলিঙ্গ দেশ ও বাঙ্গালা দেশ মুসলমানগণের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্য বিষয়ক নানারূপ সংশ্রবে আবদ্ধ ছিল। গুজরাট সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। মহারাষ্ট্রের উত্তরভাগে গুর্জ্জর রাষ্ট্র অবস্থিত। এই ভূভাগের অন্তর্গত সুবিখ্যাত পাটন এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নিকট একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালী বণিক এক সময়ে দূর সমুদ্র বাহিয়া নানাদেশে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া গমনাগমন করিত এবং ভারতবর্ষে ও তন্নিকটবর্ত্তী যে কয়েকটি স্থান ও বন্দরে তাহারা যাতায়াত করিত তন্মধ্যে সিংহল ও পাটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা কোন সময়ে সত্য ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত, উহাই কালক্রমে জাতীয় অবনতির যুগে কবির পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়িল। তত্রাচ সেই প্রাচীন গৌরবময় যুগের ক্ষীণ আলোক-

রশ্মি এই অতিশয়োক্তিপ্রিয় কবিগণের লেখার মধ্যেও থাকিবারই কথা! তাঁহাদের বর্ণিত বণিকরাজগণ যে যে পথ বাহিয়া উপকূলের ধারে ধারে বাণিজ্য তরী বাহিত করিতেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহা কলিঙ্গ, সিংহল, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের সুবিখ্যাত বন্দরসমূহই বটে এবং বর্ণনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। কবি বর্ণনার পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের এই দুই দেশের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করাই স্বাভাবিক। সত্য বটে কবিকঙ্কণের সময় বাঙ্গালার স্বাধীনতার গৌরবময় যুগ অতীত হইয়াছিল এবং ইহার অধিবাসিগণের দেশবিদেশে জলপথে বাণিজ্য করিতে যাওয়া ও উপনিবেশ স্থাপন করার কথা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই দুই দেশের নামের কথা কবিকঙ্কণের যুগে বাঙ্গালী বিস্মৃত হয় নাই এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কথা তৎকালেও বঙ্গবাসীর মনে সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। আর একটি কথা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মোগল বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক লোক। বাঙ্গালার ন্যায় কলিঙ্গ ও গুজরাট এই উভয় প্রদেশই তখন মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং এই দুই প্রদেশের কথা কবির অপরিজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। এই হেতু, এই দু'টী স্থানের নাম কবি ব্যবহার করিলেই চমকিত হইবার কোন হেতু নাই এবং বাঙ্গালার অভ্যন্তরস্থ অপেক্ষাকৃত নগণ্য স্থানসমূহ অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে, এই কথা স্থির যে কবি গুজরাটের বর্ণনাই করুন আর কলিঙ্গের বর্ণনাই করুন—লোকচরিত্র ও দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্গালারই করিয়াছিলেন, কারণ বিশেষরূপে বাঙ্গালার

অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল এবং তিনি নিজের চোখে যাহা দেখিয়াছিলেন বা নিজে যে বিষয় সম্যকরূপে জানিতেন তাহার বর্ণনাই সর্ব্বদা কাব্যের মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া তিনি কোন দিন সত্য ঘটনার বিষয়সমূহকে একেবারে নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যে কত মূল্যবান সংবাদের খনি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও তাহাদের বিভিন্ন স্তরের স্ত্রী পুরুষের গৃহস্থালীর কথা এই পুথিতে যেরূপ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য পুথিতে তদ্রূপ দুর্ল্লভ। ইহা ছাড়া পশুপক্ষী, গাছপালা ও ফলফুলের বিবরণও ইহাতে যথেষ্ট আছে। বাঙ্গালার গ্রাম্যজীবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই পুথি পড়িলে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, অন্য কোন পুথি পাঠে তদ্রূপ হয় না। আশা করি বিশেষজ্ঞগণ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়-গুলি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবেন।

বাঙ্গালা রামায়ণ

বাঙ্গালা রামায়ণ—

রামায়ণ বাঙ্গালীর পরম আদরের গ্রন্থ। ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও সাহিত্যের দিক হইতে রামায়ণের কাহিনী বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শকে বহু দিক হইতে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়াবলী প্রধানতঃ এইরূপ :—

১। রামায়ণ কত প্রকার, অর্থাৎ সংস্কৃত ভিন্ন আর কত ভাষার বা কত জাতীয় রামায়ণ আছে ?

২। বাঙ্গালা রামায়ণের আদর্শ কোন্ রামায়ণ ?

৩। বাঙ্গালীর ধর্ম্মের উপর বাঙ্গালা রামায়ণের প্রভাব কিরূপ ?

৪। বাঙ্গালীর জাতীয়তা-সংগঠনে বাঙ্গালা রামায়ণ কিরূপ সাহায্য করিয়াছে ?

৫। বাঙ্গালা রামায়ণের সাহিত্যিক মূল্য কিরূপ ?

৬। বাঙ্গালা রামায়ণ কে প্রথম রচনা করিলেন ?

৭। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল কোন্ সময়ে ?

৮। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা রামায়ণকারদিগের পরিচয় কি ?

৯। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরে বাঙ্গালার বাহিরের রামায়ণগুলির কোনও প্রভাব আছে কিনা ?

১০। অপরাপর বাঙ্গালা রামায়ণের কবিগণ কৃত্তিবাসের নিকট কতটা ঋণী ?

১১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভিন্ন অপরাপর বাঙ্গালা রামায়ণ সম্বন্ধে যথাযোগ্য সমালোচনা কতটা প্রয়োজন ?

১২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা কিভাবে করা যাইতে পারে?

রামায়ণ অনেক ভাষায় পাওয়া যায়; যথা,—১। সংস্কৃত (হিন্দু ও জৈন), ২। বাঙ্গালা, ৩। হিন্দী, ৪। মৈথিলী, ৫। মারাহাট্টী, ৬। তৈলঙ্গী, ৭। দ্রাবিড়ী, ৮। ওড়িয়া, ৯। পাঞ্জাবী, ১০। উর্দ্দু, ১১। পালি (বৌদ্ধ), ১২। যবদ্বীপী, ১৩। শ্যামদেশীয় ইত্যাদি! ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা রামায়ণ আলোচনা উপলক্ষে সংস্কৃত (হিন্দু ও জৈন), পালি (বৌদ্ধ), ও হিন্দী রামায়ণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রামায়ণের প্রাচীন গল্প উত্তরভারতে একরকম এবং দক্ষিণভারতে অন্যরকম। উত্তরভারতীয় গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ ও সংস্কৃত এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা রামায়ণ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণের গল্পের মধ্যে জৈন রামায়ণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ রামায়ণের গল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দশরথ-জাতক। ইহা ছাড়া সাম, বেস্সান্তর ও সম্বুলজাতকের নাম করা যাইতে পারে। দশরথজাতকে রামের গল্প আছে, কিন্তু অন্যান্য জাতকে সংস্কৃত রামায়ণের কোন কোন ঘটনার সহিত জাতক বর্ণিত কাহিনীর সাদৃশ্য আছে মাত্র। এইস্থলে লঙ্কাবতারসূত্তেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে (পালি)। সংস্কৃত হিন্দু রামায়ণের মধ্যে বাল্মীকি-রামায়ণ ছাড়া অগ্নিবেশ্য রামায়ণ, ব্যাসকৃত পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড—বাৎসায়ন-শেষ-সংবাদ), মহাভারত (বনপর্ব্ব—মার্কণ্ডেয় মুনি বর্ণিত) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ (বাল্মীকি) ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ আছে।

বাঙ্গালা রামায়ণের মধ্যে প্রথমেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের নাম

করা যাইতে পারে। তৎপর রঘুনন্দন, কবিচন্দ্র, রামানন্দ, চন্দ্রাবতী ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের নাম প্রসিদ্ধ। বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ কেহ কেহ যথারীতি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।) এই জাতীয় রামায়ণমধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদ, বর্দ্ধমান রাজবাটীর গদ্যে অনুবাদ ও হেম বিদ্যারত্নের গদ্যে অনুবাদ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন গ্রিফিৎ সাহেব, কতিপয় Volumeএ। নানা ভাষায় রামায়ণ লিখিত হওয়ায় ইহার গল্পাংশে নানারূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এক বাল্মীকির রামায়ণই বাঙ্গালা বা গৌড়ীয়, বোম্বাই ও জার্ম্মাণ সংস্করণ হিসাবে নানাস্থানে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত রামায়ণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ওয়েবার, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, রিস্ ডেভিড্‌স্, বুলার এবং ওল্‌ডেন্‌বার্গের নাম প্রসিদ্ধ।

হিন্দী রামায়ণ—তুলসীদাস কৃত এবং সবিশেষ বিখ্যাত। বইখানির নাম—"রামচরিত-মানস"।

তারিখ—

বাল্মীকি-রামায়ণের কাল—৪০০ খৃঃ পূঃ (অমীমাংসিত)।

জাতক রামায়ণ—প্রায় ৫৪৩ খৃঃ পূঃ ? (বুদ্ধের জন্মকাল—৫৫৭ খৃঃ পূঃ)

* কৃত্তিবাসের রামায়ণ—১৪শ, ১৫শ অথবা ১৬শ খৃঃ অঃ ?

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ—১৬শ খৃষ্টাব্দের শেষাংশ।

শঙ্কর কবিচন্দ্র—১৭শ-১৮শ খৃষ্টাব্দ।

* কৃত্তিবাসের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় আমি পাঠকগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I. এবং আমার লিখিত 'রাজা গণেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ (Journal of Letters, Vol. XIII, C. U.) পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অন্যান্য রামায়ণের তারিখ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বাল্মীকি-রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ—

(ক) বাল্মীকিতে "যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্" কিন্তু পদ্মপুরাণে "যৎ ক্রৌঞ্চপক্ষিণোরেকম্" (পাতাল খণ্ড—৯৪ অধ্যায়) রহিয়াছে।

(খ) বঙ্গদেশ-প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণে আছে রামচন্দ্র রামায়ণ গান লবকুশের মুখে শুনিবার নিমিত্ত বন্ধুগণের সাহায্যে তাহাদিগকে অশ্বমেধযজ্ঞের সময়ে রাজধানীতে আনিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণে আছে রামচন্দ্র নিজেই রাজপথ হইতে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনেন।—পদ্মপুরাণেও ইহা দেখা যায়।

(গ) বাল্মীকি-রামায়ণ বর্ণিত শ্লোকসংখ্যা ২৪০০, কিন্তু অদ্ভুতরামায়ণ-মতে ২৫০০, পদ্মপুরাণের মতেও তাহাই।

(ঘ) বাল্মীকির রামায়ণ সপ্তকাণ্ড। কিন্তু পদ্মপুরাণ-মতে ছয়কাণ্ড। ইহাতে বালকাণ্ডের অন্তর্গত করিয়া অযোধ্যাকাণ্ড ধরা হইয়াছে।

> ষট্‌কাণ্ডানি সুরম্যাণি যত্র রামায়ণেঽনঘ।
> বালমারণ্যকং চান্যৎ কিষ্কিন্ধ্যাং সুন্দরং তথা।
> যুদ্ধমুত্তরমন্যচ্চ ষড়েতানি মহামতে॥
>
> —পাতালখণ্ড, পদ্মপুরাণ, ৯৪ অধ্যায়।

(ঙ) ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে একটি বৃদ্ধার কথা (বেশ্যাদিগের নেত্রীস্থানীয়া) পদ্মপুরাণে আছে। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে নাই। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে নানাস্থানে পদ্মপুরাণ ও বাল্মীকিতে গরমিল আছে।

(চ) অন্ধমুনির উপাখ্যান পদ্মপুরাণে আছে, বাল্মীকিতে নাই। কালিদাস রঘুবংশে অন্যান্য ঘটনার ন্যায় এই ঘটনাটিও পদ্মপুরাণ হইতে লইয়াছেন।

(ছ) বঙ্গীয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার বাহিরের রামায়ণে (বাল্মীকি) বানরগণের জন্মসম্বন্ধে বিভিন্নভাবে বর্ণনা আছে। (পদ্মপুরাণের সহিত বিশেষ কোন মিল নাই)।

(জ) "পদ্মপুরাণের ১৫শ ও ১৬শ—কেবল এই দুই অধ্যায়ে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে সীতার সহিত রামের বিবাহ পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে যে তাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত পুরাণের ১৫শ অধ্যায়ে রামের বাল্যক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতি যেরূপ ধরনে লিখিত বাল্মীকির এই রামায়ণের সহিত তাহার অনেক স্থানে ঐক্য দেখা যায় না। পদ্মপুরাণকার মৃগয়াকালে রাম কর্ত্তৃক একটি হরিণীরূপী মায়াবী রাক্ষসকে বধ করাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার এই আদর্শ বাল্মীকি-রামায়ণে কিংবা বঙ্গীয় বাল্মীকি-রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হইল না। যদিও বঙ্গীয় রামায়ণের অনেক স্থলে পদ্মপুরাণ হইতে বিবিধ বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায় (ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি উপাখ্যান মিলাইয়া দেখ), কিন্তু এই অংশটি তাহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।"—রাজকৃষ্ণ রায়—বালকাণ্ড।

(ঝ) তাড়কা রাক্ষসী বধের জন্য বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে দশরথের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রকে অনুগমন করার চিত্রটি বাল্মীকি যতটা বিশদভাবে দিয়াছেন পদ্মপুরাণকার ব্যাস সেরূপ দেন নাই। ইহাতে বর্ণনা অতীব সংক্ষেপ। (কৃত্তিবাসী রামায়ণেও বর্ণনা সংক্ষিপ্ত)।

বাঙ্গালা রামায়ণ—

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রধান আদর্শ বাল্মীকি-রামায়ণ নহে, পদ্মপুরাণ (ব্যাসকৃত)। বঙ্গীয় সংস্কৃত রামায়ণ ও অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণের অনেক স্থানে গরমিল আছে। আবার বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশের বর্ণিত অনেক ঘটনার মিল নাই। উদাহরণ— যযাতির পুত্রগণের বিষয়। পদ্মপুরাণের কথা তো ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "মহর্ষি বাল্মীকি প্রথম সর্গ হইতে এই সর্গ (বালকাণ্ড) পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিয়াছেন পাঠক তত্তাবত আপনি দেখিলেন। কিন্তু কবিবর কৃত্তিবাস তদীয় রামায়ণে প্রথম হইতে এতদূর পর্য্যন্ত যেরূপ ধরনে লিখিয়াছেন তাহা বাল্মীকির সহিত মিলে না (গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১—১৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতালখণ্ডে বাৎসায়ণ-শেষসংবাদে শ্রীরামচরিত যেরূপ ধরনের লিখিত আছে তাহা বাল্মীকি রামায়ণের সহিত সকল স্থানে সমান নহে। পদ্মপুরাণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রণীত বলিয়া কথিত। সুতরাং পরবর্ত্তী ব্যাসদেব পূর্ব্ববর্ত্তী বাল্মীকির মূল অবলম্বন করিয়া যে স্বকীয় কল্পনাবলে উহার অনেকস্থলে অন্যরূপ পরিবর্ত্তন সংযোজনাদি করিবেন তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, কথকেরা রামায়ণ কহিবার সময় বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থস্থিত রামচরিত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি মিশ্রিত করিয়া ফেলেন। বোধ হয়, ভিন্ন রুচির শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জনার্থ এইরূপ কহিয়া থাকেন। কৃত্তিবাস সেই কথকদিগের কথকতা ও নবীকৃত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তদীয় রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং বাল্মীকির প্রকৃত রামায়ণের

সহিত তাঁহার রামায়ণের সামঞ্জস্য নাই। তাঁহার রামায়ণ-লিখিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান স্কন্দ ও মার্কণ্ডেয়পূরাণ হইতে গৃহীত। কৃত্তিবাস সগরবংশের বিবরণ ও গঙ্গা-আনয়নাদি (১-১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) একস্থলে লিখিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি তাহা করেন নাই। তিনি ৩৮শ হইতে ৪৪শ সর্গে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন (পৃথক জায়গায়)। তাহাও আবার কৃত্তিবাসের সহিত সকল স্থানে মিলে না। তাহার কারণ কৃত্তিবাস বাল্মীকিকৃত বঙ্গদেশ-প্রচলিত রামায়ণের কোন কোন অংশ ও পুরাণাদি হইতে অন্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। যথাস্থলে এই বিষয়ের টীকা করা যাইবে। বাল্মীকির সহিত এ পর্য্যন্ত কেবল কয়েকটি স্থানে কৃত্তিবাসের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিল দেখা যায়, তাহাও আবার স্থানে স্থানে মিশ্রিত।”—রাঃ রাঃ। “মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের ঘটনাদি বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে ছায়ামাত্র লইয়া পদ্মপুরাণ হইতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন।—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড দ্রষ্টব্য”—রাঃ রাঃ।

কৃত্তিবাস—

আদিকাণ্ডে (—বালকাণ্ড) ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের বৃদ্ধার চরিত্রাঙ্কনে কৃত্তিবাসের আদর্শ পদ্মপুরাণ, বাল্মীকি নহে। বাল্মীকিতে বৃদ্ধা নাই। বাল্মীকিতে আছে আগে রাম, পরে সীতা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু, কৃত্তিবাসের মতে আগে সীতা, পরে রাম জন্মেন (পদ্মপুরাণ মতে)। কৃত্তিবাস পদ্মপুরাণ অবলম্বন করিয়া গৌতম কর্ত্তৃক ইন্দ্রের অভিশাপ লিখিয়াছেন। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। সগর রাজার সহস্র সন্তান জন্মের কথা কৃত্তিবাস কতকটা বাল্মীকির মতে ও

কতকটা পদ্মপুরাণ মতে বর্ণনা করিয়াছেন। গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণ বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, রঘুনন্দন গোস্বামী ও ভারতচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের ১৬শ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা আছে কৃত্তিবাস অনেকটা সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অসমঞ্জের বিবরণ কৃত্তিবাস অনেকটা কল্পনা খাটাইয়া ও গোলমাল করিয়া লিখিয়াছেন। তাড়কাকে বধ করিতে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগমন করেন। বাল্মীকি, পদ্মপুরাণ ও কৃত্তিবাসের বর্ণনার মধ্যে কোনও মিল নাই। ভরত ও শত্রুঘ্নকে দশরথ প্রথম পাঠাইয়াছিলেন—ইহা কৃত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত। বাল্মীকির রামায়ণে বীরবাহু, ভস্মলোচন, অতিকায় ও তরুণীসেন বধ নাই। ইহাও কৃত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞের কথা ও মেঘনাদ-বধের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও মাইকেলে মিল নাই। আধ্যাত্ম রামায়ণে, রঘুনন্দন গোস্বামীর রামায়ণে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে "কৈকেয়ীকে দশরথের বরদান"-প্রসঙ্গ বিভিন্নরূপ আছে।*

তুলসীদাস—হিন্দী রামায়ণ—

তুলসীদাসের আদর্শ বাল্মীকি; কৃত্তিবাসের আদর্শ পদ্ম-পুরাণ। তুলসীদাসে 'রামাত' সম্প্রদায় ও কৃত্তিবাসে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে তুলসীদাস রামায়ণ লেখেন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আর কৃত্তিবাস রামায়ণ লেখেন তাহার অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে, এই কথা ঠিক হইলে তুলসীদাস স্থানে স্থানে (যেমন শিব-

---

* কৃত্তিবাস বর্ণিত রত্নাকর দস্যুর বৃত্তান্ত বাল্মীকিতে নাই। তবে স্কন্দ-পুরাণে জনৈক ঋষির বল্মীকের অন্তরালে বসিয়া তপস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পার্ব্বতী বিবাহ) রঘুবংশ হইতে অনুকরণ করিলেও অনেক বিষয় কৃত্তিবাস হইতেও লইয়াছেন।

কৃত্তিবাসের পরে তুলসীদাস কিনা,—এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। উভয়েরই লেখা ভক্তিপ্রধান ; তবে, তুলসীদাসে রাম আদর্শ ও কৃত্তিবাসে শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীচৈতন্য আদর্শ ও ভক্তির মাত্রাটা পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তক্ষেপে কিছু বেশী। রঘুনন্দনে ভক্তির কথাটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৬শ ও ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গালা রামায়ণে তুলসীদাসের অনুকরণ আছে ; যথা—রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন, চন্দ্রাবতী, ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণ। বাঙ্গালার রামায়ণে হনুমানের প্রতি অতি ভক্তির আরোপ পরবর্ত্তী কবিগণ তুলসীদাসের অনুকরণে করিয়া থাকিবেন। রামমোহন তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসকে অনুকরণ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের অনেক বর্ণনা তুলসীদাসের অনুকরণে আছে।

কবিচন্দ্র—

কবিচন্দ্র অনেকগুলি। ইহা নাম নহে, উপাধি মাত্র। ইহাদের মধ্যে কতিপয়, যথা—

(ক) শঙ্কর (ভবানীশঙ্কর) কবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭শ-১৮শ শতাব্দী। রামায়ণের কবি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গদরায়বারের কবি ?

(খ) শঙ্কর (ভবানীশঙ্কর) কবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দাস উপাধি। ১৭শ-১৮শ শতাব্দী। ভাগবতকার। বোধ হয় (ক) ও (খ) একই ব্যক্তি।

২। "গঙ্গাবন্দনা"র কবি নিধিরাম ও মতান্তরে অযোধ্যারাম মিশ্র চক্রবর্ত্তী (মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা)।

ইনিও কবিচন্দ্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রায়বার-অংশরচক (?)। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ।

৩। জনৈক কবিচন্দ্রের (Descriptive Catalogue, C. U.) সময়কাল প্রদত্ত হয় নাই। রামায়ণ-লেখক।

৪। ১৯শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র। মল্লভূমের রাজা গোপাল-সিংহের সমসাময়িক।—(D. C. Sen).

৫। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র। শিবায়নের কবি। খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

যাহা হউক, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে প্রসিদ্ধ কবিচন্দ্র দুইটী আবার কাহারও কাহারও মতে কবিচন্দ্র তিনটী বা ততোধিক। মোটের উপর, কবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাঃ দীনেশচন্দ্র প্রথমে ১৬শ শতাব্দীর মনে করিলেও পরে ১৮শ শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন (কুরুচির জন্য)। অপর মত (বসন্ত চট্টোপাধ্যায়) কবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬শ শতাব্দীর লোক। ভাগবতকার কবিচন্দ্র ১৬শ শতাব্দীর লোক। কাহারও কাহারও মতে এই কবিচন্দ্রই সম্ভবতঃ অঙ্গদ রায়বারের কবি। কবিচন্দ্রের রায়বার কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—রামায়ণ

(রচনাকাল—১৮৩৮ খৃঃ অঃ)

বিশেষত্ব—১। রাম হইতে হনুমানের প্রতি ভক্তি বেশী।

২। বৈষ্ণবভক্তিপ্রধান গ্রন্থ।

৩। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের উল্লেখ আছে। উহা বাল্মীকিতে নাই।

৪। উত্তরাকাণ্ড শিববিবাহ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে।

৫। অদ্ভুত রামায়ণের নিকটে ঋণী। অঙ্গদ রায়-
বারের লেখক জানা নাই। সহস্রস্কন্ধ
রাবণের বৃত্তান্ত ইহাতে আছে, এই বৃত্তান্ত
রামমোহন উত্তরাকাণ্ডে দিয়াছেন। এই
অংশ শাক্তপ্রধান।

রামানন্দের রামায়ণ—

রামানন্দ (17th-18th century) নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন। উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Dr. Sen—Bengali Rāmāyan-এ বলিয়াছেন: "The writer is evidently a Sākta and Tāntrik and firm believer in Kāli. He is evidently a Tāntrik of the Mahāyana Buddhism. He is besides a believer in Rāma" (pp. 234).

জৈন ও বৌদ্ধ রামায়ণের বিশেষত্ব এই রামায়ণে আছে। আবার অদ্ভুত রামায়ণ হইতেও রামানন্দ মালমসলা লইয়াছেন। যথা—অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দুইজন কবি রামের বাল্যলীলা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের একজন রামানন্দ অপরজন রঘুনন্দন।

জগৎরামের রামায়ণ—

রচনাকাল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ। "It is an epitome of all the legends prevalent in Bengal about Rāma"—Dr. Sen's Bengali Rāmāyan, pp. 249.

ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে (১) সুন্দরাকাণ্ডে

রামের সহিত রাবণের ধর্ম্মালোচনা আছে। ইহা লঙ্কাবতার সূত্তের (200 A. D.) অনুকরণ; (২) ইন্দ্রজিতের স্ত্রী সুলোচনার লঙ্কাপ্রবেশ—রামের বৈরীহিসাবে নহে, ভক্ত-হিসাবে। (মাইকেল তুলনীয়); (৩) অষ্টকাণ্ড, সপ্তকাণ্ড নহে। উত্তরাকাণ্ডের আগে পুষ্করকাণ্ড ও সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ; (৪) শাক্তপ্রভাব ও রামের রাসলীলা উভয়ই বর্ত্তমান। সুতরাং বৈষ্ণবপ্রভাব সুস্পষ্ট।

ভবানীচরণের রামায়ণ—(লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়)

রচনাকাল ১৮শ শতাব্দী। ইহাতে লক্ষ্মণের প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা আছে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ—

রচনাকাল ১৬শ শতাব্দী। ইহার বিশেষত্বগুলি নিম্নে দেওয়া গেল:—

(১) কুকুয়ার (কৈকেয়ী-কন্যা) উপাখ্যান।

(২) সীতা কর্ত্তৃক রাবণের চিত্রাঙ্কণ। চন্দ্রাবতী ও অপরাপর কবিগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকিতে ইহা নাই।

(৩) জৈনপ্রভাব। হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, রাবণ ও বানরগণের বর্ণনা দ্বারা রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। রামের বৃত্তান্ত অল্প। দক্ষিণ-ভারতের রামায়ণের ইহাই বিশেষত্ব। রামের ঈর্ষা বর্ণনায় চন্দ্রাবতী জৈন রামায়ণের অনুকরণ করিয়াছেন। (৪) জৈন রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রেম বর্ণনা আছে। জৈন মতে অযোধ্যায় রাম ও লক্ষ্মণ আরও কতিপয় স্ত্রী গ্রহণ করেন।

রঘুনন্দনের রামরসায়ন—

রচনাকাল ১৮শ শতাব্দী। ইহার প্রধান বিশেষত্ব :—

(১) বৈষ্ণবভাবের প্রাধান্য; (২) অনেক বর্ণনায় তুলসীদাসের অনুকরণ। এই রামায়ণে হনুমানের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। (৩) বর্ণনার পারিপাট্য। কবি তাড়কা রাক্ষসীর রূপ যেরূপ ভয়ঙ্কররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে কবিত্ব আছে। (৪) রঘুনন্দন কর্ত্তৃক গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধে তাহা শেষ করা যায় না। সুতরাং স্থানাভাববশতঃ কেবল দুই একটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াই উপস্থিত ক্ষান্ত হইতে হইল।

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা

পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকথাগুলি বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গীতিকাসমূহের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা ডাঃ সেন যেরূপ আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকাগুলি পাঠ করিলে নানারূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই সকল প্রশ্ন নিয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।* মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খণ্ড) ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) নামক সংগ্রহদ্বয়ের ভূমিকাতে নানারূপ গবেষণামূলক আলোচনা আছে। বর্ত্তমান সমালোচনায় ভূমিকা দুইটি আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে।

এই গীতিকাগুলি কত প্রাচীন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। ভাব, ভাষা বা বিষয়বস্তু ইহার কোনটীকেই অবলম্বন করিয়া একটি পালাগানের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। পল্লীগীতির অনাড়ম্বর ভাব ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। নগরে, রাজদরবারের আবেষ্টনীর ভিতরে যেরূপ কবিতা রচিত হইবে, গ্রামে, পল্লীজননীর ক্রোড়ে বসিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত কবি তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ কবিতা রচনা করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। ভাষার দিক দিয়া বলিতে

---

* মৈমনসিংহ-গীতিকা (প্রথম খণ্ড), ভূমিকা, পৃঃ ৬—৮, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড), ভূমিকা, পৃঃ ১০, ৮৯ ও ৯৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গেলে বলিতে হয়, নগরে বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া ও কৃত্রিম সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করে গ্রামের লোকের ভাষা সেইরূপ হয় না। গ্রামে ভাব বা ভাষার পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত কম হয়। বহু প্রাচীন কালের ভাষার অনেক নিদর্শন এখনও পল্লীগ্রামেই পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ নহে। এই শ্যামা বঙ্গভূমির এক এক অংশে এক এক রূপ কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে। ইহা পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে চট্টগ্রামের ভাষা রঙ্গপুরবাসীর পক্ষে বুঝা সহজ নহে, আবার বাঁকুড়ার ভাষা ঢাকাবাসীর পক্ষে ভালরূপে বুঝাও কঠিন ব্যাপার। সব দেশ সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সুতরাং কোন একটি প্রাদেশিক বা বা স্থানীয় দুরূহ শব্দ কোন ছড়ায় পাওয়া গেলেই তাহার দুর্ব্বোধ্যতা হেতু তাহাকে সুপ্রাচীন বলিবার কোন হেতু নাই। এমতাবস্থায় ভাব, ভাষা, বিষয়-বস্তু, প্রকাশ-ভঙ্গি প্রভৃতি সম্যক আলোচনা করিয়া সুক্ষ্মবিচারের কষ্টিপাথরে ছড়াগুলিকে ফেলিতে হইবে এবং কোন ছড়া কত আধুনিক তাহা এই উপায়ে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ইহা যে কত কঠিন কাজ তাহা বিশেষজ্ঞগণ ভালরূপেই জানেন। সমালোচক এরূপ ক্ষেত্রে ভাবুক যত কম হইবেন ততই মঙ্গল।

প্রাচীন ছড়াগুলি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী দুই তিন শতাব্দীকাল মধ্যে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ একটি মত আছে। এই মতানুসারে পুর্ব্বমৈমনসিংহের উপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবকাল অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত (রাজা শশাঙ্কের কাল) এবং এতদ্দেশীয় তান্ত্রিকতাবিহীন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। তাহাই যদি হইল তবে

অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল ২।৩ শতাব্দী হয় কিরূপে? উহা তো পাঁচ শত বৎসর হইয়া পড়ে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব ত এই সময়ের মধ্যেই ধরা হইয়াছে। তবে মুসলমানদিগের আগমনের ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বেই কামরূপের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান হইয়াছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরেও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য হিসাবে কতকটা ক্ষমতাশালী ছিল ইহা অনুমান করিয়া না লইলে এই মতের কোন সামঞ্জস্য হয় না। ইতিহাসে দেখা যায় খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত পালরাজগণ ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রবল এবং ১১শ কি ১২শ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সেনরাজগণ বাঙ্গালাদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সুতরাং প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবকাল সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধরিলে তখন পাল ও সেন রাজবংশের জন্ম হয় নাই। এই প্রভাবকালের শেষ বিখ্যাত রাজা শশাঙ্ক শুধু প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা ছিলেন না। তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলার কিয়দংশের রাজা বলিয়াও জানি। কিন্তু ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হইতে যখন তান্ত্রিকতার পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুধর্ম্ম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বিরাজমান তখন উত্তরবঙ্গে পালরাজগণ প্রবল। তবেই দেখা যাইতেছে ৮ম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজগণ ও ১১শ শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেনরাজগণ বাঙ্গালায় প্রভুত্ব করিতেছেন। তাহার পরই মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কি এরূপ মনে হয় না যে কামরূপের পর ক্রমান্বয়ে পাল, সেন ও মুসলমান রাজগণ বাঙ্গালাদেশে তথা মৈমনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন? ডাঃ সেনের

বোধ হয় মত যে পাল ও সেনরাজগণের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ-রাজগণ তাঁহাদের অবনতির সময়েও নামেমাত্র পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। পালরাজাদের কথা ছাড়িয়া দেই, সেনরাজগণও এই অঞ্চলে কখনও ভালরূপে প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই, যেহেতু সেনবংশ পশ্চিম ময়মনসিংহ অধিকার করিলেও নদীমাতৃক ও অরণ্যবহুল "পূর্ব্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ব করিতে পারেন নাই"। তাহার ফলে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের ক্ষুদ্র রাজগণ সেন রাজগণ প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও কৌলিন্য স্বীকার করেন নাই এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও তদ্দেশ প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বিস্মৃত হ'ন নাই। আমরা যেন একটা কথা ভুলিয়া না যাই। মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় দেখিতে পাই যে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ড সেনরাজগণকে তত আমল না দিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সব রাজত্বের বর্ণনায় যে রাজ্যের নাম সর্ব্বাগ্রে পাই, উহা সুসঙ্গ-দুর্গাপুর। এই রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল ১২৮০ খৃষ্টাব্দ। ইহাই দেখিতেছি সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত খণ্ডরাজ্য। এই সময় বাঙ্গালায় পাঠান শাসন-কাল, কারণ মুসলমানগণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালায় প্রথম রাজত্ব স্থাপন করে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে।* পশ্চিম-বঙ্গে সেন রাজবংশ ধ্বংসের প্রায় একশত বৎসর পরে যদি প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে পূর্ব্ব-

* V. Smith's Early History of India, 4th ed., p. 414, R. D, Banerjee's The Palas of Bengal, p. 100 এবং বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

মৈমনসিংহ মুক্ত হয় তবে এই অঞ্চলে সেন রাজবংশের প্রভাবের কথা উঠিতেই পারে না। নবদ্বীপ মুসলমানদিগের অধিকারে আসিলে পূর্ব্ব-বঙ্গের রামপাল রাজধানী হইতে সেনরাজগণ আরও প্রায় শত বর্ষ সে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা ডাঃ সেন মনে করিয়া থাকিলে আর কোন গোল বাধে না। কিন্তু তিনি মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২।৩ শতাব্দী কাল অর্থাৎ ১০ম, ১১শ কি ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপ-প্রভাবমুক্ত পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের অবস্থার কথা কল্পনা করিয়াছেন। তিনি খণ্ডরাজ্যগুলির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় ধরিয়াছেন, ১২শ কি ১৩শ শতাব্দী।

সেন রাজবংশ পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা ইহা নিয়া মতভেদ আছে। মৈমনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল একটী বৃহৎ দেশ নহে। ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাত এই মৈমনসিংহ জেলাকে কোনাকোনিভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সেন রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গের নদীমাতৃক ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন আর এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে অধিকার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিশাল পদ্মা নদী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের রামপালে একটী রাজধানী পর্য্যন্ত স্থাপন করিলেন আর ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে অপারগ হইলেন, ইহা কিরূপ কথা? সমগ্র বঙ্গদেশ সেনরাজগণ প্রবর্ত্তিত যে সামাজিক বিধি গ্রহণ করিল, পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ তাহা গ্রহণ করিল না। সেই প্রদেশ কামরূপের অধিকারমুক্ত হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের তদ্দেশ প্রচলিত প্রাচীন আদর্শ আঁকড়াইয়া রহিল, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পাল রাজাদের সমসাময়িক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য উত্তর-বঙ্গ ও ময়মনসিংহ অতিক্রম

করিয়া কুমিল্লা (ত্রিপুরা) পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। আবার সেন রাজারা পদ্মা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে ভয় পাইতেন. আর কামরূপ-রাজগণ গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া মৈমনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্য-তো বিস্তার করিলেনই, আরও তাহাদের রাজত্বের অবসানে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মটুকু পূর্ব্ব-মৈমনসিংহবাসীদিগকে দিয়া গেলেন। এইরূপ যুক্তি আমরা সমর্থন করিতে অপারগ।*

মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় আছে "এই সকল গীতিকার নায়ক নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ, পনের এমন কি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিতা দেখিতে পাই।" ভূমিকার অপর স্থলে যাহা আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই,—"এই হিন্দুধর্ম্মে (কামরূপের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে) বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত 'গৌরীদান,' আচার-বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই।" এই উপলক্ষে জাতিভেদ যে প্রবল ছিল না তাহাও "কঙ্ক ও লীলা" উপাখ্যান হইতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে! বোধ হয় ভূমিকা-লেখক দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে কামরূপের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব এখানে কিরূপ প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। অথচ আমরা ডাঃ সেনের আবিষ্কৃত গীতিকাগুলির মধ্যেই অবাধ প্রেমের বর্ণনা অপেক্ষা রঘুনন্দনী বাল্য-বিবাহের বিবরণই অধিক পাইতেছি। এই বাল্য-বিবাহ রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা গোপীচাঁদেরও হইয়াছিল। মাণিকচন্দ্র

* মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রাজার গানে (১১-১২শ শতাব্দী)* এবং অন্যান্য স্থলে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। গীতিকাগুলির মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বাল্য-বিবাহের নমুনা দেখাইব।

(ক) "বার না বছরের কন্যা পরমাসুন্দরী।
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মন ভারি॥"
—মলুয়া (মৈমনসিংহ-গীতিকা)

(খ) "এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ মায়॥"
—কমলা (মৈঃ গীঃ)

(গ) "দশ বছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যা গো ভাব্যা চিন্তা মরে॥
এতেক সুন্দর কন্যা গো তাহাতে যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যার গো কেবা করে গতি॥"
—দেওয়ান ভাবনা (মৈঃ গীঃ)

(ঘ) "বার না বছরের কন্যা তেরোতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল॥"
—কঙ্ক ও লীলা (মৈঃ গীঃ)

(এই লীলার প্রেমাস্পদ কঙ্ক, লীলা হইতে অল্প বড় ছিল।)

(ঙ) "এগার বছরের কন্যা বারয় নাইসে পড়ে।"
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগরে॥"
—কাজলরেখা (মৈঃ গীঃ)

---

* পালাগান অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ১১-১২শ শতাব্দীর গোপীচন্দ্রের গীত একটী পালাগান। পালাগানগুলি ধর্ম্মমূলক নহে। মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার পালাগানগুলি গোপীচন্দ্রের গীতের সহিত আমরা একশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। তবে উভয়ের তফাৎ মূলতঃ সময়ঘটিত। শেষোক্ত গীতিকাগুলি (মৈঃ গীঃ ও পূঃ বঃ গীঃ) যে অনেক পরে রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

(চ) "দেবাংশী হইল কন্যা নয় না বছরে।
যৈবনের লক্ষণ দেখা দিল না শরীরে॥"
—কাঞ্চনমালা (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা)

(ছ) "বার না বছরের হারে শান্তি তের নাহি পোরে।
আজ যৈবনের ভারেতে শান্তি তুমি জামাই বল কারে॥"
—শান্তি (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা)

মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার বর্ণনা গীতিকাগুলি হইতে উদ্ধৃত করার আর বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। অনধিক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাগণের যৌবনোদ্গম ও প্রেম-কাহিনীর সুদীর্ঘ বর্ণনা গ্রাম্য কবিগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই গীতিকাগুলিতে ৮ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের বিবাহের কথা এত প্রচুর রহিয়াছে যে রঘুনন্দনকে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। "মহুয়া, ধোপার পাট" এবং "মৈষাল বন্ধু"র ন্যায় কতিপয় গীতিকায় যুবক-যুবতীর অবাধ প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ গল্পের সংখ্যা বেশী নহে। অল্পবয়সে বা যৌবনাবস্থায় যেখানেই অবাধ প্রেমকাহিনীর বর্ণনা আছে, সেইখানেই স্পষ্ট দেখান হইয়াছে যে ইহা সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। ইহা গ্রাম বা সমাজের "দশজনে" পছন্দ করে না। তাহাতে অন্ততঃ প্রেমিকার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের ও আত্মোৎসর্গের বর্ণনা আছে বটে এবং তাহাতে প্রেমকে যথেষ্ট উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজবন্ধনটিকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হইয়াছে। সমাজের সাধারণ বিধির বিরুদ্ধে যাইয়াই ত প্রেমিকযুগলের কঠোর প্রেম-সাধনার পরীক্ষা হইয়াছে। সুতরাং বল্লালী, বিশেষতঃ রঘুনন্দনী, সমাজবন্ধন স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তাহা প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে গীতিকথায় যে তারতম্য করা হইয়াছে তাহার কথা। প্রেমিকা প্রেমাস্পদের জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে যেরূপ কষ্ট ও কলঙ্ক সহ্য করিয়াছে, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে, তাহা যে কোন যুগে ও যে কোন দেশে নারীজাতির গৌরবের বস্তু। এই গীতিকাগুলির অধিকাংশ নারী-চরিত্র সীতা-সাবিত্রী কি বেহুলা-ফুল্লরার সহিত একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার উপযুক্ত। এই মহীয়সী নারী-চরিত্রকে ডাঃ সেন যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু গীতিকা-গুলির পুরুষ-চরিত্র কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে? উহা নারী-চরিত্রের পাশে অত্যন্ত ম্লান ও হীন হইয়া পড়ে নাই কি? নারী তাহার মর্য্যাদা রাখিয়াছে কিন্তু পুরুষ তাহার গৌরব রাখে নাই। প্রায়শঃই গল্পে দেখা যায় তরুণ বয়সে কোন পুরুষ কোন সুন্দরী তরুণীর প্রেমে পড়িয়া উন্মত্তপ্রায় হইল এবং হয়তো সমাজের কলঙ্ক মাথায় লইয়া (যাহা নারীর পক্ষেই বেশী) দেশত্যাগী হইল। তারপর কিছুদিন গত হইলে, মোহ কিছু কাটিলে, সেই ব্যক্তি অন্য একটি রূপসীর (বিশেষতঃ তাহার যদি অর্থবল থাকে) প্রেম লাভের সুবিধা হইলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রথমা তরুণীটিকে কলঙ্ক ও বিপদের অকূল সমুদ্রে নিতান্ত নির্ম্মমের মত নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে দ্বিতীয়া রমণীকে গোপনে বিবাহ করিল এবং সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিল। ইহাই ময়মনসিংহ এবং পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকাসমূহের অধিকাংশ গল্পের সারবস্তু। অপর পক্ষে বিপদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া নারী-চরিত্র যেন আপন

মহিমায় ও উজ্জ্বলতায় আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তরাত্মা ভরিয়া উঠে। এই গীতিকাসমূহের নারীগণ ধ্রুবতারার ন্যায় স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি সকল অবস্থাতেই স্থিরচিত্ত থাকিয়া যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে সমাজের কলঙ্ক ও কৃতঘ্ন প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান অগ্রাহ্য করিয়া অবশেষে স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাতে এই নারীগণের মহিমা জগতের নারীসমাজে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। এই বিষয়ে উদাহরণের অভাব নাই। চাঁদবিনোদ ও মলুয়া, জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি কত গল্পের উদাহরণ দিব? বহুবিবাহের প্রতি বাঙ্গালী যুবকের আকর্ষণ এই গল্পগুলিতে সূচিত হইতেছে। কঙ্ক ও লীলার গল্পে কঙ্ক যে ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহা নিয়া ডাঃ সেন অনেক কিছু কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই গল্পের সামাজিক অত্যাচারের বিবরণ সম্বন্ধে ত তিনি নীরব দেখিতেছি। কাঞ্চনমালা গীতিকা ও এতদ্দেশে প্রচলিত মালঞ্চমালার গল্পে যে শিশু-স্বামীর কথা পাওয়া যায় তাহাতে কি বল্লালী কৌলীন্যের ফলে সামাজিক অবস্থার ছায়াপাত হয় নাই? ভেলুয়া গীতিকাতে ভেলুয়ার বিবাহ ব্যাপারে সামাজিক শিথিলতার লক্ষণ থাকিলেও ভেলুয়ার পিতার কৌলীন্যগর্ব্বের কথাও আছে। এই সব গল্প গোঁড়া হিন্দুসমাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটি কথা এইস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ডাঃ সেনের মতানুবর্ত্তী হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, এই যে প্রেমিক-প্রেমিকার সমাজকে ভয় না করিয়া প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব বলিদানের প্রবৃত্তি—ইহার মধ্যে বৈষ্ণব সমাজের কিছু ছাপ থাকা সম্ভব কি? বৈষ্ণবদিগের সহজিয়া

সম্প্রদায়, পরকিয়া ভাব, চণ্ডীদাস ও রামীর প্রচলিত জীবন কাহিনী এই গীতিকাসমূহের প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী হওয়ার সাহস জোগায় নাইতো? আবার রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী বর্ণিত কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় রাজা হওয়ার ব্যাপার অর্থাৎ কীর্ত্তন গায়কের "মাথুরের" কিছু কিছু ছায়া এই গীতিকাগুলিতে বিবৃত নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকাকে ত্যাগের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায় কি?

গীতিকার নারী চরিত্রের দিক দিয়া একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। সংস্কার-যুগের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে বাঙ্গালী নারী কর্ম্মপ্রবণা ও বীরাঙ্গনা ছিল। মঙ্গল কাব্যগুলিতে তাহার বহু নিদর্শন আছে। সংস্কার-যুগে অনুবাদ গ্রন্থসমূহের প্রভাবে সীতা-সাবিত্রীর অন্তরালে লখা-বেহুলা ম্লান হইয়া গেলেও মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই সব নারী বরাবর যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইহাদের গুণরাশি অটুটই রহিয়া গিয়াছে। গীতিকাবর্ণিত নারীদিগের সহিত মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নারীদিগের এই হিসাবে কতকটা মিল দেখা যায়। গীতিকাসমূহের মহুয়া, মলুয়া, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি রমণীর তেজস্বিতা ও চিত্তের দৃঢ়তা লখা ও বেহুলার অনুরূপ দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই যেন এক ছাঁচে ঢালা। কথাসাহিত্যের মালঞ্চমালাকেও একই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিছুটা বৌদ্ধ ও কিছুটা হিন্দু কর্ম্মবাদ এই চিত্তের দৃঢ়তার মূলে নিহিত আছে কি না কে বলিবে?

বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত এই গীতিকা সমূহের মাধুর্য্যের দিক দিয়া বেশ ঐক্য আছে। দুইই প্রেম বিষয়ক এবং মর্ম্মস্পর্শী। তবে একটি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া

লিখিত, অপরটি জাগতিক প্রেমকাহিনীতে পূর্ণ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মানুষী প্রেম নহে বলিয়া গীতিকা সমূহের বর্ণিত প্রেম-কাহিনীর ন্যায় আমাদের চিত্তকে তত অভিভূত করিতে পারে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ও দেবতার লীলা-কাহিনী, সুতরাং উচ্চতর স্তরের সন্দেহ নাই; কিন্তু সুখ-দুঃখ পূর্ণ মানুষী-প্রেম এবং প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়কে ঘনিষ্ঠতর ভাবে স্পর্শ করে। এই হিসাবে গীতিকাগুলি বাঙ্গালী জাতির অতি প্রিয়বস্তু। ডাঃ সেন বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকাসমূহের কোন কোন ছত্রে বেশ মিল দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার নিজের ভাষায়, *

(১) "বৈষ্ণব কবি ও কৃষক কবি, কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইঁহাদের উভয়েই বাঙ্গালাদেশের ভাবখনির সন্ধান পাইয়াছিলেন; দেহভাব-মূলক যে সব চলিত-কথা দেশময় প্রচলিত ছিল, সহজিয়ারা যাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই চলিত-কথার ঋণ বৈষ্ণব কবি এবং কৃষক কবি উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বৈষ্ণব কবিদের অপূর্ব্ব পদের সন্ধান এই সকল কৃষক কবি জানিতেন, তবে তাহাদের ভাষা কিছুতেই এত অমার্জ্জিত এবং প্রাকৃত-প্রধান থাকিতে পারিত না।"

(২) পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার ভূমিকায় বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের পদের ও গীতিকা-রচকগণের ছড়ার অনেকস্থলে যে সাদৃশ্য আছে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাতে ভূমিকা-লেখক পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও লোচনদাসের পদসমূহ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া ধোপার পাট, ভেলুয়া,

* (১) ভূমিকা, ধোপার পাট, পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, পৃ ১০।

(২) ভূমিকা, পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা. ২য় খণ্ড, ৮৯—৯৩ পৃষ্ঠা।

দেওয়ান ভাবনা, ঈশা খাঁ, মহুয়া ও কমলার নানা ছত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন ও সাদৃশ্য দেখাইয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এমন কি অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ও গীতিকাগুলির স্থানে স্থানে যে ভাব এবং ভাষার মিল আছে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি ডাকের বচন, ময়নামতীর গান ও কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের নাম করিয়াছেন।

এখন একটি প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। সত্যই কি কৃষক কবি বৈষ্ণব কবির নিকট ঋণী নহেন? "এই পল্লীগীতিকা-গুলি পড়িলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব ইহাতে এক ফোঁটাও নাই। গীতিকাগুলির ভাষা অমার্জ্জিত, বৈষ্ণব-কবির ভাষা মার্জ্জিত। গীতিকাগুলির প্রেম কথার মধ্যে মধ্যে একটা উচ্চ রাজ্যের আভাষ ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু তাহারা আধ্যাত্মিকতার ধার একেবারেই ধারে না। এগুলি গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার কথায় পূর্ণ,—রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করাইবার মত তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই। কোন কোনও গীতি চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই পরবর্ত্তীকালের। এই পালাগান-রচকেরা বৈষ্ণব কবিদের কোনও সন্ধান রাখিতেন না। তাঁহারা নায়ক নায়িকার প্রেমে মস্‌গুল হইয়া পালা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধার তাঁহারা ধারেন না। তথাপি বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে অনেক সময় ছত্রে ছত্রে ইহাদের অতীব বিস্ময়কর মিল দৃষ্ট হয়।"

এই বিষয়ে আমাদের ধারণা কি তাহা নিম্নে লিখিতেছি। বৈষ্ণব কবি ও কৃষক কবি উভয়েই যদি কোন মূল উৎসের খোঁজ পাইয়া থাকেন ভাল কথা। ডাঃ সেন

প্রাচীন সাহিত্যে তাহার উদাহরণ খুব বেশী দেখাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কৃষক কবি বৈষ্ণব কবির নিকট বরং ঋণী—কিন্তু বৈষ্ণব কবি কৃষক কবির নিকট যে ঋণী নহেন এমন অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ময়মনসিংহের পূর্ব্বসীমার মেঘনা নদ পার হইয়া চৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বাঙ্গালাদেশের অপরাপর অংশেরই ন্যায় এই চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। সহজিয়াগণ আরও পূর্ব্বকাল হইতে সাধনা দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই চলিত কথার ঋণ কৃষক কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাদের ও বৈষ্ণব কবিদের সকলেরই একটি মূল উৎস ছিল। তাহার পর ভূমিকাতে আছে "কোন কোনও গীতি চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই পরবর্ত্তীকালের "অর্থাৎ ১৫শ কি ১৬শ শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালের রচনা।"

চণ্ডীদাস এক কি বহু ছিলেন, সেই তর্কের গহন বনে এখন প্রবেশ নাই করিলাম। তাহা হইলে দেখিতেছি, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রভাবকালে এই ছড়াগুলি রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বৈষ্ণব কবিগণের এই কৃষক কবিগণের অনুকরণ কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, বরং উল্টা মনে হয়। কৃষক কবিগণ মূল উৎস হইতে কতটা ধার করিয়াছেন জানি না, কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের অনেক পদ যাহা ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে কিছুটা নিয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলে অন্যায় হয় না। উভয়ের মূল কতকটা এক থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব কল্পনা করিলে ইহার নিকট হইতে কৃষক কবির কিছু ঋণ নেওয়া অসম্ভব কি?

গীতিকাগুলির ভাষা মার্জ্জিত না হইতে পারে বা রাধা-কৃষ্ণের কথা না থাকিতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কতকগুলি প্রচলিত বচন তাহারা অমার্জ্জিত ভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? রাধা-কানুর বিষয় ও পালাগানগুলির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের কথা পালাগানে থাকিতে পারে না।

মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় আছে "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী দুই তিন শতাব্দী কাল" (?) পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ সেনবংশীয় রাজগণের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল পালাগান-গুলিতে তাহার প্রভাব রহিয়াছে। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ রঘুনন্দনকে স্বীকার করে নাই, এই হেতু পালাগানোক্ত প্রধান চরিত্রগুলি সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত ও রঘুনন্দন-শাসিত হিন্দুধর্ম্মের বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইলে পালাগানগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীন অন্ততঃ সেই পালাগানগুলির অধিকাংশ এই সময়েরই রচনা। আমরা ইহাই বুঝিতেছি। আবার তিনি বলিতেছেন, "কোন কোন গীতি চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে কিন্তু অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালের"। এই উক্তিটিও ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কিরূপ হইল? ডাঃ সেনের শেষোক্ত কথা মানিতে হইলে ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে পালাগানের যুগ ধরিতে হয়। হয় মানিতে হয় গীতিকাগুলির সময় ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে, অথবা মানিতে হয় ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে ইহাদের রচনাকাল। কোন্ কথাটা মানিব? যাহা হউক, সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ধরিয়া লইলাম যে, ডাঃ সেনের অভিমত ১০ম

হইতে তৎপরবর্ত্তী কতিপয় শতাব্দী মধ্যে গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ এতগুলি শতাব্দী অনুমান করার অর্থ এই যে গীতিকাগুলির সময় নির্দ্ধারণ ডাঃ সেন স্পষ্টভাবে করিতে পারেন নাই। আমাদের কিন্তু একটা কথা মনে হয়। অল্প কয়েকটি গীতিকার বিষয়বস্তু পুরাতন এমন কি পালরাজা-দিগের আমলের গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সমসাময়িক হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ পালাগান (যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে) তত পুরাতন নহে এবং রচনা ১৮শ।১৯শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। কোন আধুনিক গ্রাম্য কবি যদি ইচ্ছা করেন তবে এইরূপ কবিতা এখনও লিখিতে পারেন। শব্দ-সম্ভার ও রচনাভঙ্গী প্রাচীন ছাঁচে ফেলিয়া লেখা আধুনিক গ্রাম্য কবির পক্ষে তত কঠিন নহে। বিষয় বস্তু ও স্থানীয় ব্যবহৃত শব্দগুলি এই বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। তবে রচনাভঙ্গী প্রাচীন আদর্শে করিতে গেলেও আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন গ্রাম্য কবির প্রচেষ্টা তাহাতে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ, গাছপালা ও গ্রাম্য দৃশ্যের বর্ণনাগুলিতে যথেষ্ট আছে। ১০০।২০০ শত বৎসরের প্রাচীন ছড়াগুলিই বোধ হয় বেশী। ৩০০।৪০০ শত বৎসরের প্রাচীন ছড়া বোধ হয় খুব অল্প। বিষয়বস্তু এই বিষয়ে আমাদিগকে কতকটা সাহায্য করিতে পারে। ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বেকার ছড়া কোন কোনটি থাকিতে পারে, তবে তাহা ধরা কঠিন। শুধু ভাষা দ্বারা যে উহা ধরা অসম্ভব ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেক প্রাচীন শব্দের এখনও প্রচলন আছে আবার অনেক বৈদেশিক শব্দেরও বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে, এবং স্থানীয় শব্দ ব্যবহারের ত কথাই নাই। আধুনিক অর্থাৎ বর্ত্তমান কবিগণের আংশিক বা সম্পূর্ণ হস্তচিহ্ন কোন কোন পালাগানে যে নাই তাহাই বা কে বলিবে?

ভাবের দিক দিয়া পালাগানগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা ভালই হইয়াছে। আমরা পালাগানগুলিকে ইতিহাস-প্রধান ও ইতিহাস-অপ্রধান গীতিকাতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি। ইতিহাস-প্রধান পালাগানে মুসলমান আধিপত্যের উদাহরণ সূচিত হইতেছে সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক হইতে ধরিয়া লইলে এইগুলির রচনার সময় মোটামুটি বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। অনৈতিহাসিক পালাগুলিতে এই সুবিধা নাই। যাহা হউক ইতিহাসের অনেক অমূল্য তথ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই গীতিকাসমূহের অনেকগুলিতে পাওয়া যায়। এই গীতিকা-গুলিতে দেশ ও সমাজের ছবি অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে এবং মুসলমান দেওয়ান, কাজি, কারকুন, সিন্দুকি প্রভৃতির অত্যাচার কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কবিত্ব, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য বেশভূষা প্রভৃতি নানারূপ তথ্যের দিক দিয়া গীতিকাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ভাষার দিক দিয়াও গীতিকাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে এই গীতিকাগুলির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। অনাবিষ্কৃত গীতিকাগুলিও যাহাতে আমাদের চক্ষে পড়ে তাহার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গেই এই গীতিকাগুলি প্রধানতঃ পাওয়া যাইতেছে। উত্তর-বঙ্গেও পালা-গান পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ হইতে এইগুলি বাহির করা হইতেছে না কেন? কেহ কেহ বলেন মধ্য-যুগে পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে পশ্চিম-বঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও গোলযোগ সর্ব্বদা বেশী হওয়াতে পালাগানগুলি এই অঞ্চল হইতে লোপ পাইয়াছে। এই কথার সত্যতা কতদূর জানি না।

মুসলমানগণ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গেই অধিক এবং ইহাদের আগমনে রাজনৈতিক আবর্ত্তন পূর্ব্ব-বঙ্গেও ত কম হয় নাই। আমাদের মনে হয় পশ্চিম-বঙ্গে পালাগান বাহির করিবার সম্যক্ প্রচেষ্টা এখনও হয় নাই। উহা হইলে পরে এই বিষয়ের মতামত দেওয়া সমীচীন হইবে।

গীতিকা-সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপের ন্যায় আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই কল্যাণের কথা।

সেকালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য

(আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের (১৬শ শতাব্দী) কঠোর শাসনে বাঙ্গালী হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা একেবারে নিষেধ হইয়া গিয়াছে।) ইহার ফলে এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের নিকট "কালাপানি" পার হওয়া নিতান্ত অধর্ম্মের কাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার একটি গৌরবময় যুগের অবসান হইয়া গিয়াছে। সত্য বটে আজকাল অনেক হিন্দুসন্তান সমুদ্রপথে বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুর নিকট তাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াই যাইতেছেন এবং এই হেতু ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাহারা এইরূপ না করিতেছেন তাহারা হিন্দুর শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছেন—ইহাই রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের মত। যাহা হউক রঘুনন্দনের নিষেধবিধি প্রচারের পূর্ব্বে, অতি প্রাচীন হিন্দুযুগে যে বাঙ্গালী অকুতোভয়ে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য সম্ভার আনিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বৈদেশিক সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আছে। যদিও এই সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থগুলিই এসম্বন্ধে আমাদের অবলম্বন, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অনৈতিহাসিক কাব্যগ্রন্থসমূহের ভিতরে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আছে এবং সমসাময়িক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী জীবনের সুন্দর একটি আলেখ্য এই কল্পনাপ্রসূত গ্রন্থরাজি হইতে পাওয়া যায়। (প্রাচীন চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলি সেকালের (হিন্দুযুগের) বাঙ্গালীর নৌযাত্রার ইতিহাসে পরিপূর্ণ।

এই কাব্যসমূহের কবিগণ অধিকাংশই মুসলমানযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের কাব্যবর্ণিত বিষয়সমূহ তৎপূর্ব্ববর্ণিত হিন্দুযুগকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতেছে। মনসামঙ্গলগুলির মধ্যে বিজয়গুপ্ত (১৫শ শতাব্দী) ও বংশীদাসের (১৬শ শতাব্দী) কাব্যদ্বয় এবং চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের (১৬শ শতাব্দী) কাব্যখানি এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।*

উল্লিখিত পুথিগুলির বর্ণনামতে বাঙ্গালী বণিকগণ সাধারণতঃ সিংহল এবং পাটনে (গুজরাট) বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা যে পথে যাইতেন তাহাতে নিম্নলিখিত সামুদ্রিক বন্দরগুলি পড়িত।

(১) পুরি। (২) কলিঙ্গপত্তন (কলিঙ্গপটম)। (৩) (৩) চিল্কাচুলি (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরস্থ ও চিল্কাহ্রদের নিকটস্থ চিকাকোল)। (৪) বাণপুর। (৫) সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। (৬) লঙ্কাপুরী। (৭) পাটন (গুজরাটের প্রসিদ্ধ বন্দর)।

সমুদ্রপথের বর্ণনায় অনেক দ্বীপের নাম আছে। সেইগুলিকে এখন চিনিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ প্রলম্ব, নাকুট, অহিলঙ্কা, চন্দ্রশল্য ও আবর্ত্তন দ্বীপের নাম করা যাইতে পারে। প্রাচীন কাব্যসমূহ পাঠ করিলে দেখা যায় যে নাবিকগণ সমুদ্রগামী তরীগুলিকে উপকূলের সন্নিকট দিয়াই পাল উড়াইয়া, দাঁড় বাহিয়া চালিত করিত। তাহারা দাঁড় টানিবার সময় সারি গান গাহিতে থাকিত।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার নিম্নলিখিত বর্ণনা বংশীদাসের মনসামঙ্গলে আছে। ইহাতে কবিসুলভ উদ্দাম কল্পনার

* এই সম্পর্কে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যখানিরও নাম করা যাইতে পারে।

বাহুল্য থাকিলেও প্রাচীনকালে বাঙ্গালী যে ভাবে সমুদ্র-যাত্রা করিত তাহার বেশ একটি বিবরণ পাওয়া যায়। যথা :—

"চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।
চম্পকনগর মিলি, কৌতুকেতে হুলাহুলি
জয়ধ্বনি উঠিল গগনে॥
ডুলাই বলে বাও বাও, বন্দিয়া ভবানী পাও,
প্রথমে চলিল শঙ্খচূড়।
ছোটিঘটি তার পাছে, যাতে ভরা ভরিয়াছে,
হাঁড়ীপাগ ধুকুরা বিস্তর॥" ইত্যাদি।

এইরূপে চৌদ্দ ডিঙ্গা, মধুকর সঙ্গে নিয়া চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে চলিলেন।—

"গোপাল মিরবর চলে ঠাট আগুয়ান।
তার সঙ্গে হাত নাও ব্যাল্লিশ খান॥
পানি চরি আগে চলে ব্যাল্লিশ নাও।
ঠাঁট পাছে চন্দ্রধর বলে বাও বাও॥
নিজরাজ্য ছাড়াইল হাস্য পরিহাসে।
ছাড়ায় কামারহাটী আঁখির নিমেষে॥" ইত্যাদি।

এইরূপে তিনি ক্রমে মধ্যনগর, প্রতাপগড়, গোপালপুর, রামনগর ও পরিশেষে "কালীদ' সাগরে" আসিয়া পড়িলেন। ইহা বাহিয়া চাঁদ ক্রমে ডাইনে গন্ধর্ব্বপুর ও বামে বীরাঙ্গনা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বামে পিচলতা পড়িয়া রহিল ও তিনি সম্মুখে রামবিষ্ণুপুরী দেখিতে পাইলেন। ইহার পর গঙ্গাসাগরে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা ভাসিল। এখানে তিনি মহা উৎসাহে পূজার্চ্চা করিলেন। এখান হইতে

ক্রমাগত পাঁচ মাস ডিঙ্গা বাহিয়া অবশেষে চাঁদ সদাগর গন্তব্যস্থান পাটনে পৌঁছিলেন।*

কবি বংশীদাসের ভাষায় ঃ—

"নানান্ দুর্গম পথ গেল ছাড়াইয়া।
কলিঙ্গ উৎকল দেশ ডাইনে থুইয়া॥

*　　*　　*

চৌদ্দ ডিঙ্গা বায়্যা যায় দক্ষিণ পাটন।
বিষরী মুড়ান বাদ্য বায় ঘন ঘন॥

*　　*　　*

সেতুবন্ধ রামেশ্বর রাখিয়া দক্ষিণে।
সম্মুখে কনকলঙ্কা দেখে ততক্ষণে॥

*　　*　　*

দ্রুতগতি যায় ডিঙ্গা তুলাই কাঁড়ারী।
ছাড়াইল ডাইনে কনকলঙ্কাপুরী॥
তদন্তরে মলয় পর্ব্বত করি বাম।
বাও বাও করি যায় নাহিক বিশ্রাম॥
অহি নৃপতির দেশ বিজয়ানগরী।
ছাড়াইল সে বাঁক হাতের বাম করি॥
সম্মুখে রামের স্থান দেখে মনোহর।
সুভাই পণ্ডিত ঠাঁই পুছে সদাগর॥

*　　*　　*

তথা হনে চন্দ্রধর করিল গমন।
সম্মুখে নিলক্ষ বাঁক † দিল দরশন॥

---

* দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত বংশীদাসের মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩২৭-৩৩৯ দ্রষ্টব্য।

† বোধ হয় আরব সাগরস্থ লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ।

দেখি নিলক্ষের বাঁক পরম বিস্ময়।
দিগ্বিদিক কিছু তার নাহি পরিচয়॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণ।
কোন দিক ভেদ নাহি সব জলাকীর্ণ॥
জলের কল্লোল দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
উঠিছে হিল্লোল যেন পর্ব্বত শিখর॥

* * *

অস্ত যায় যথা ভানু উদয় যথা হনে।
দুই তারা * ডাইনে বামে রাখিল সন্ধানে॥
তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাঁড়ার।
সেই তারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥

* * *

ছাড়ায় নিলক্ষ বাঁক পবন গমনে।
উদ্দেশেতে কাছাকাছি পাইল পাটনে॥" ইত্যাদি।

এইতো গেল বংশীদাসের বর্ণনা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও † ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য পথের কতক সন্ধান দিয়াছেন। বাঙ্গালার অভ্যন্তরের নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম‡

* তখনকার দিনে কম্পাসের ব্যবহার ছিল না, তাই অকুল সমুদ্রে তারা দেখিয়া নাবিকগণ গন্তব্যপথ স্থির করিত। এই রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মহাদেশেই বর্ত্তমান ছিল।

† কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), পৃঃ ১৯৫—২০২ দ্রষ্টব্য।

‡ সপ্তগ্রাম একসময়ে বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবিকঙ্কণের বর্ণনায়—

"কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সকল।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥"

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যস্থান অতিক্রম করিয়া ধনপতি অবশেষে—

"কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের খাল বামদিগে থুয়্যা॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥

* * *

বাহ বাহ বলিয়া ডাকে সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
চিল্কাচুলির ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা বার্ণপুর বামদিকে থুয়্যা॥
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥

* * *

বুদ্ধিবলে সাধু হাত্যাদহ হৈল পার।
দক্ষিণে সুমেরুশৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মোহানে সীতাখালী প্রবেশে হাড়খাল।
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥

প্রভৃতি দেশের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম বন্দর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার মতে—

"এসব সফরে যত সদাগর বৈসে।
জঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে।
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্তে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।"

চন্দ্রকূট পর্ব্বতখান যক্ষরাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
পর্ব্বতসমান ঢেউ বহে সপ্ততাল।
দূর হৈতে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর ডানি বামে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রিদিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে।
উপনীত ধনপতি হৈলা কালীদহে॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর।” ইত্যাদি।

উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ে কবিকল্পনার মধ্য দিয়া আমরা বঙ্গের এক গৌরবময় যুগের সহিত পরিচিত হইয়া থাকি। কবিদ্বয়ের উদ্দাম কল্পনার মধ্যেও যেন অনেকটা সত্য নিহিত আছে। ইঁহারা বর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের সমসাময়িক অবস্থারও উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছেন।

“ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥”—

এই দুই ছত্রে কবিকঙ্কণ তাহার সমসাময়িক পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের কথা উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছেন। পর্ত্তুগীজগণ ফিরিঙ্গি নামে এক সময়ে এতদ্দেশে অভিহিত হইত। তাহাদের অত্যাচারকাহিনী বঙ্গের মুসলমান যুগের ইতিহাসের একাংশ মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বংশীদাস ও মুকুন্দরাম উভয়েই কালীদহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালীদহ বংশীদাস বঙ্গসীমায় ও মুকুন্দরাম সিংহলের সন্নিকটে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় স্থানে স্থানে সুগভীর ও সুনীল বারিরাশিকে প্রাচীন কালে “কালীদহ”

বলিত। এখনও সমুদ্র-যাত্রা "কালাপানি যাওয়া" নামে লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী বণিকগণ সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের দেশগুলির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। ইহা খুব স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহাতে কবিকল্পনা ও বিকৃতরুচির যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও কথাগুলির মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত আছে, ইহা নিশ্চয়। বর্ণনাটি এইরূপ—

"উত্তরদিকের কথা শুন সদাগর।
সে দেশের রাজা আছে নামে মুক্তিশ্বর॥
বুঝিতে না পারি কিছু সে দেশের মর্ম্ম।
সে দেশের লোকে খায় মরিচের অন্ন॥
পূর্ব্ব দেশের রাজা নাম বিদ্যাসঙ্গ।
সে লোক সাধু তার যত বড় অঙ্গ॥
পরস্পর যত লোক তমরূপে থাকে।
ব্রাহ্মণজাতি বসে যত সকলেই চর্ম্ম কাটে॥
জ্যেষ্ঠ ভাইএর বধূ করে কনিষ্ঠে বদলা।
ভগ্নী লইয়া ঘর করে ভাইএরে বলে শালা॥
সকল জাতির নারী বেড়ায় দীর্ঘ ছান্দে।
বিচিত্র বসন দিয়া দুই স্তন বান্ধে॥
সব জাতি একাচারী নাহিক আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই কুৎসিত আকার॥
পশ্চিম দেশের কথা শুন সদাগর।
সেই দেশের লোক সব বড়ই বর্ব্বর॥
সেই দেশের লোকে চলে গলায় দিয়া পাটা।
হিন্দু ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই সকলের কর্ণ কাটা॥

ষোল বৎসরের হৈলে যুবতীর বিয়া।
পুরোহিতের বাড়ী থাকে দক্ষিণার লাগিয়া॥
বিবাহ করিয়া দেয় ভগ্নীপতির ঘরে।
অপত্যাদি হয় যদি তাহার উদরে॥
দেশেতে আনিয়া শেষে সমভাগ করে।
সেইভাগ সহ তার স্ত্রীকে নেয় ঘরে॥
ভট্টাচার্য্য হাল চষে গলায় পৈতা দিয়া।
স্ত্রীলোকেতে ঘুটা বাছে বিবস্ত্র হৈয়া॥
দক্ষিণ পাটনের কথা শুন সদাগর।
অবোধ নগর সেই পরমস্থন্দর॥
সে দেশের রাজার কথা শুন সদাগর।
রাজার নাম তথা বিক্রমকেশর॥
সে দেশের লোক সব অতি বড় ধনী।
দোলায় করিয়া রাখে মাণিক্য দোহারী॥"*ইত্যাদি।

কবি বোধ হয় "উত্তরদেশ" অর্থে তিব্বত, চীন, প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরদিকের বৌদ্ধদেশ সমূহ মনে করিয়াছেন। এই সব দেশের অধিবাসীগণের আহার্য্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে লঙ্কার প্রতি অত্যধিক প্রীতি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার 'পূর্ব্বদেশ' বলিতে ব্রহ্মদেশকেই (বিশেষতঃ নিম্নব্রহ্ম) বুঝাইতেছে। জাতিবিচারহীন বৌদ্ধগণকে নিয়াই বোধ হয় কবি শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন যে "সব জাতি একাচারী নাহিক আচার।" "ব্রাহ্মণজাতি বসে যত সকলেই চর্ম্ম কাটে"—এই উক্তিটিতে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধপুরোহিতগণের কতিপয় দিবসাবধি শবরক্ষার প্রথার প্রতি বোধ হয় কবির লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

---

* বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত) ১২৩ পৃষ্ঠা এবং নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (১৩শ শতাব্দী, কঃ বিশ্ববিদ্যালয়) দ্রষ্টব্য।

"বিচিত্র বসন দিয়া দুই স্তন বান্ধে" উক্তিটিতে ব্রহ্মদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ও পরিচ্ছদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়া থাকিবে। পশ্চিম দেশের বর্ণনায় "ষোল বৎসরের হইলে যুবতীর বিয়া" হইতে "দেশেতে আনিয়া শেষে সমভাগ করে" এই কয়টি ছত্রে মান্দ্রাজ অঞ্চলের হিন্দুসমাজে বিবাহের বিশেষ রীতি ও উত্তরাধিকারের বিশেষ নিয়মের প্রতি শ্লেষ করা হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের "নায়ার"দিগের মধ্যে অদ্যাপি যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত, তাহাতে কবির অতিশয়োক্তির ভিতরেও যে সত্যতা রহিয়াছে তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। দক্ষিণ-পাটন সম্বন্ধে বংশীদাস যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে উহা এককালে গুজরাটের সমুদ্রতীরবর্ত্তী খুব ঐশ্বর্য্যশালী নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ভারতে "পাটন" বলিতে নগরীকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ বহু পাটনের নাম পাওয়া যায়—যথা "ললিত-পাটন", "লঙ্কা-পাটন" ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাটন বলিয়াই বোধ হয় গুজরাটের পাটন বন্দরকেও "দক্ষিণ-পাটন" বলিত। ইহাই সম্ভবতঃ সুবিখ্যাত সোমনাথ-পাটন।

বাঙ্গালী বণিকগণ যে ভাবে পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন তৎসম্বন্ধে সেকালের রীতিনীতি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরদাদার ঝুলির" একটি গল্পে ইহার বেশ একটি উদাহরণ আছে। এই গল্পটির নাম "কাঞ্চনমালা"। কাঞ্চনমালার স্বামী জনৈক সদাগর বাণিজ্যের জন্য বিদায় হইয়া যাইবার সময় দেখা গেল নৌকা নড়ে না। এই সময় নৌকার প্রধান মাঝি বা কর্ণধার ভুলালধন সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

"সওদাগর !—একি !—ডিঙ্গা কেন নড়ে না ?—মায়ের কাছে তো বিদায় নিয়াছ ?"

"নিয়াছি ।"

"ভোগ প্রসাদ মুখে দিয়াছ ?"

"দিয়াছি ।"

"তবে কেন নৌকা নড়ে না ?"

"কি জানি ।"

"কি জানি ? আচ্ছা,—

সায় সিনান বাকী নাই ? পঞ্চদীপ বাদ নাই ?"

"না ।"

"দেব মন্দিরের অষ্টচূড়া ধন কাঞ্চন উরা পূরা ?"

"হাঁ ।"

"তবে নৌকা নড়িবে না কেন ?"—বলিয়া, দাঁড়ে পালে টান দিল । হাল ভাঙ্গিয়া গেল, মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িল, দাঁড়ের দড়া ছিড়িয়া গেল ; নৌকা 'এক বিশ'ও গেল না ।

রাগিয়া কর্ণধার মাঝি বলে,—"সওদাগর ! দেবদেবতা সকলের কাছে গড়—প্রণাম বিদায় নেও নাই ?"—

"তা নিয়াছি"

"যা'র যা'র খোরাক বাঁটিয়া দিয়াছ ?"

"দিয়াছি ।"

"তবে আর আদায় বিদায় কোন ঠাঁই ?—আচ্ছা—

বিদায় নিয়াছ বৌর ঠাঁই ?"

"ওরে বাপ !—না !"

"হাঁ ! তবেইতো নৌকা নড়ে না ! যাও, বিদায় নিয়া আইস ।" *

* কাঞ্চনমালা (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরদাদার ঝুলি), পৃঃ ১৬৯—১৭০ দ্রষ্টব্য ।

প্রাচীনকালে কোন বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলে সেই সময় তাহার স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকিতেন তবে বণিককে ইহার স্বীকারোক্তি স্বরূপ একটি দলিল লিখিয়া দিয়া যাইতে হইত। ইহাকে "জয়-পত্র" বলিত *। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। তৎকালে এইরূপ করিবার বোধ হয় বিশেষ কারণ ছিল। বংশীদাসের মনসামঙ্গলেও ইহার ইঙ্গিত আছে।

হিন্দু বণিকগণ বাণিজ্য কার্য্য যে সর্ব্বদা খুব সততার সহিত সম্পন্ন করিতেন না, তাহার অনেক উদাহরণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আছে। শঙ্খমালার গল্প হইতে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"কোনও বেণে দারুচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।
কোনও বেণে কাহনের বস্তু বেচে সিক্কার দরে॥
কোনও বেণে পাথরের টুক্‌রা ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
মহামাণিক্য সাহামাণিক্য বলে লোকেরে বিকয়॥" †

* "সিংহল চলিবা প্রভু দীর্ঘ পরবাস।
লাজ খণ্ডাইয়া বলি গর্ভ ছয় মাস।
এমত শুনিয়া সাধু জায়ার ভারতী।
জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখেন ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরীত।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিনু লিখিত।
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই কালে হপন দেশে যাই পরবাস"॥

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য পৃঃ ১৯০ দ্রষ্টব্য।

† শঙ্খমালা (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরদাদার ঝুলি), পৃঃ ২২১ দ্রষ্টব্য।

বংশীদাস ও কবিকঙ্কণ বাণিজ্য দ্রব্যসমূহের যে দু'টি তালিকা দিয়াছেন তাহাতে কবিদ্বয়ের কবিসুলভ অতিরঞ্জন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক ইহা হইতে বাঙ্গালীর বাণিজ্য-দ্রব্য সম্ভারের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তালিকা দুইটি এইরূপ :—

* "আগে আনি গুয়াপান, থুইলেক বিদ্যমান
মূল্য বলে কাঁড়ারী দুলাই।
একটি একটি পানে, মরকত দশগুণে,
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই॥
বদল করিতে চূণ, রস দিবা দশগুণ,
খয়ার বদলে গোরচনা।
সুগন্ধি এলাচি হালী, লহ মতির বদলি,
কেসর বদলে দিবা সোণা॥
শতাবরী কামেশ্বর, আনি বলে সদাগর,
এর গুণ কহিতে না পারি।
খাইয়া বুঝহ আগে, কিমত আস্বাদ লাগে,
তৌলি দিবা বদলে কস্তুরি॥" ইত্যাদি—(১)

† "কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।
লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।

---

* বংশীদাসের মনসামঙ্গল (দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত), পৃঃ ৩৮০-৩৯০ ও ৩৯২-৩৯৩ দ্রষ্টব্য।

† কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), পৃ: ১৯১ দ্রষ্টব্য।

পাটশন বদলে, ধবল চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
জোয়াদী বদলে জিরা॥" ইত্যাদি—(২)

বাঙ্গালী কবি প্রাচীন হিন্দু জাহাজ সমূহের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সবখানিই অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরে জাহাজের যে প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে, অজন্তা গুহায় বাঙ্গালী রাজপুত্র বিজয়ের জাহাজের যে চিত্র খোদিত আছে এবং সিংহলের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মহাবংশে" এই সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহাতেই যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে প্রাচীন সমুদ্রগামী জাহাজগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ছিল না। মিশরের পিরামিড এবং ব্যাবিলনে শূন্যোদ্যানের ন্যায় বৃহৎ জিনিষ প্রস্তুত করা প্রাচীনগণের স্বাভাবিক রীত্যনুযায়ীই হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে "কোশা" নামে একপ্রকার তরী আছে। তাহাও বোধ হয় "ক্রোশ" শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং সেকালের একটী না হউক, অন্ততঃ ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ নৌবহরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। বিরাটকায় তরী সমূহের সম্পর্কে বিজয়গুপ্তের নিম্নলিখিত বর্ণনা অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে।

"প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যেই নায়ে বসিয়াছে লক্ষের সদাগর॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজুসিজু।
গঙ্গার দুইকূল ভাঙ্গিয়া বেকা করে উজু॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি॥

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া।
যেই নায়ে উঠাইয়া লইল তামিলের নাটুয়া॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুইকূল ভাঙ্গে, পাতালে ঠেকে মুড়॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয়শেলপাট।
যাহার উপরে মিলিয়াছে শ্রীকলার হাট॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অনেক নায় ঝড়বৃষ্টি অনেক নায় খরা॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে টিয়াঠুঁটী।
যেই নায় ভরে সাধু পাট আর ভুটি॥" *

প্রধান তরী "মধুকর" সম্বন্ধে আছে,—

"মাটি ভরাভরি সব করিল সুসার।
হাট ঘাট বসাইল সহর বাজার॥" †

কবিকঙ্কণও তুল্যরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। যথা,—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশীগজ পানি ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥

* বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (নগেন্দ্রমোহন সেন সম্পাদিত), পৃঃ ১৯৪-১৯৫ দ্রষ্টব্য।
† ঐ ঐ

আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটিমটি।
যাহে ভরা ছিল চালু বায়ান্ন পউটী॥ *

নৌকার নামকরণ সবদেশেই সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা কাব্যের "মধুকর" নামক যে এক প্রকার তরীর উল্লেখ আছে উহা বণিকের নৌবহরের প্রধান তরী ছিল। বণিক নিজে ইহাতে বাস করিতেন। পাশ্চাত্য জগতে নৌসেনা-পতিদের নিজের ব্যবহারের জাহাজকে "ফ্ল্যাগসিপ" (flagship) বলিয়া থাকে। "মধুকর" সর্ব্বাংশে এই "ফ্ল্যাগসিপের" সহিত তুলনীয়।

প্রাচীনকালের সমুদ্রগামী তরীসমূহের এই যে বর্ণনা পাওয়া যায় ইহা শুধু কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; ইহার মধ্যে যে সত্যতা অনেক পরিমাণে নিহিত আছে, একথা নিশ্চিত। যেরূপে প্রাচীন তরীগুলি নির্ম্মিত হইত আমাদের কবিগণ তাহারও এক সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। নৌকা প্রস্তুত করিবার প্রারম্ভে একটি উৎসব হইত তাহাকে "দাঁড়াবিন্ধার" উৎসব বলা যাইতে পারে। চাঁদ সদাগরের নৌকা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে আছে চাঁদ "মাহেন্দ্র সুক্ষণ" পাইয়া "সোনার জলুই" (কিলক) নিজ হস্তে হাতুরি দিয়া কাষ্ঠে বিঁধাইলেন। এই বর্ণনাতে জানা যায় নৌকার কাষ্ঠনির্ম্মিত খোলে ধাতুনির্ম্মিত "পেটপাত" লাগান হইত। ইহা ছাড়া অতি সুন্দরভাবে "মাথাকাষ্ঠ" বা সামনের দিকের গলুই নির্ম্মিত হইত। এই

* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (মনসা মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) উল্লিখিত নানাবিবরণে পরিপূর্ণ।

মাথাকাষ্ঠ নানারূপ জীবজন্তুর মুখের আকার ধারণ করিত।* ইহা হইতেই আমাদের দেশে শুকপঙ্খী, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি নৌকার নামকরণ হইয়াছে। এই মাথাকাষ্ঠ নানারূপ বহুমূল্য প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। নৌকার মধ্যে কতিপয় কক্ষ নির্ম্মিত হইত; তন্মধ্যে প্রধান কক্ষকে "রইঘর" † বলিত। ইহাতে নৌকার মালিক বসিতেন। নৌকার মাস্তুলকে সেকালে "মালুম কাঠ" ‡ বলিত।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে নৌকা নির্ম্মাণের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

"দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা, তার সুত দারুব্রহ্মা,
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
চারিপ্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
সাতডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনুমান মহাবীর, নখে করে দুই চির,
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল বহু, নখে চিরে দিল বহু,
দারুব্রহ্মা গাঢ়য়ে গজাল॥
শিলে শানায়ে কসি, পাটী চাঁচে রাশি রাশি
নানাফুলে বিচিত্র কলস।
পিতাপুত্রে দুঁহে আটি, গজালে গাঁথিল পাটী
গঢ়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥

* † ও ‡ বংশীদাসের মনসামঙ্গল (দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত), ২৮৬ পৃষ্ঠা। সংস্কৃত গ্রন্থ 'যুক্তিকল্পতরু'তে (রাজাভোজ প্রণীত) সাতপ্রকার প্রাণীর মুখযুক্ত মাথাকাষ্ঠের উল্লেখ আছে। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত "ডিপিলন পাত্রে" অঙ্কিত "আটিক" জাহাজ, ট্রাজানের স্তম্ভে খোদিত রোমক "গ্যালি জাহাজ", এবং অজান্তা গুহায় খোদিত বঙ্গরাজপুত্র বিজয়ের সিংহলে অবতরণের চিত্র—এই সমস্তই বঙ্গকবিগণ বর্ণিত নানারূপ প্রাণীর মুখের অনুরূপ করিয়া গলুই নির্ম্মাণের সহিত তুলনীয়। সুবিখ্যাত "পেরিপ্লাস" (২৪৭ পৃঃ) গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।

গঢ়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়ারেখী
আর ডিঙ্গা গঢ়ে রণজয়া।
অতি অপরূপ সামা, গঢ়ে ডিঙ্গা রণভিমা
গঢ়িল পঞ্চম মহাকায়া॥
প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ
আঢ়ে গঢ়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা গজদণ্ডের বাতা,
মাণিকে করিল চক্ষুদান॥
গঢ়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে যার রই ঘর,
পাশে গুঢ়া বসিতে কাণ্ডার।
দুসারি বসিতে পাইট, উপরে মালুম কাঠ,
পিছে গঢ়ে মাণিক ভাণ্ডার॥"
গঢ়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চাঁচিয়া কাঁঠাল শাল, করে দণ্ড কেরোয়াল,
ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুড়লা॥" *

প্রাচীন তরী নির্ম্মাণের সুন্দর বর্ণনা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আছে। "ময়মনসিংহ-গীতিকা"য়ও (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত) ইহার উল্লেখ আছে। এই সম্বন্ধে "ময়মনসিংহ-গীতিকা"র দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে সম্পাদকের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য। চট্টগ্রামে এখনও প্রাচীন প্রথায় সমুদ্রগামী

* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, পৃঃ ২২১-২২২ দ্রষ্টব্য।

"মহাকায়া", "সর্ব্বধরা", "নাটশালা", প্রভৃতি নামে মনে হয় যে এই তরীগুলি আধুনিক জাহাজগুলির ন্যায়ই বৃহৎ ছিল এবং নামগুলি অনর্থক দেওয়া হয় নাই। "মহাকায়া" নামের সহিত বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত জলমগ্ন জাহাজ "টাইটানিক" নামের বেশ মিল আছে এবং "রণজয়ার" সহিত ইংরেজবীর নেলসনের "ভিক্টরি" জাহাজের নামের মিলও কৌতূহলপ্রদ সন্দেহ নাই।

পোতসমূহ দেশীয় সূতারমিস্ত্রীদ্বারা দেশীয় প্রথায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। "আমিনা খাতুন" জাহাজের নাম এই সম্পর্কে করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" পত্রিকার ১৭ই ভাদ্রের (১৩২৭ সন) সংখ্যায় প্রকাশিত বিস্তৃত একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগামী প্রাচীন তরীসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত হইত। যেসব কাঠদ্বারা ইহা নির্ম্মাণ করা হইত তন্মধ্যে সেগুন, গাম্ভারী, তমাল, পিয়াল ও কাঁঠালের নাম করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে কবিগণ "মনপবন" কাষ্ঠের বিশেষরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। এই "মনপবন" সত্যই নৌকা গঠনোপযোগী কোন কাষ্ঠ ছিল—না শুধু কবিকল্পনা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই নামে এখন যে কাঠ পাওয়া যায় তাহা যে "মন" ও "পবনের" গতিবিশিষ্ট মোটেই নয় তাহা সুনিশ্চিত। সংস্কৃত মহাভারতেও নৌকার উল্লেখ করিতে "মনপবনের" নাম পাওয়া যায়। যথা,—

"ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিপ্রংসিভিঃ কৃতাম্॥" *

প্রাচীন তরীসমূহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাজকর্ম্ম করিত :— †

(ক) **গাবর**—ইহারা নৌকা-চালক ছিল ও গায়ে খুব জোর রাখিত। এই হেতু ইহাদিগকে "গাঠ্যার গাবর" বলা হইত। গাবরগণ বোধ হয় অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিল।

---

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

† বংশীদাসের মনসামঙ্গল দ্রষ্টব্য।

কবিকঙ্কণের বর্ণনায় তাহাই মনে হয়। গাবরগণ সারি গাহিয়া বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালনা করিত।

(খ) **কাঁড়ারী**—এই ব্যক্তি প্রধান মাঝি ছিল এবং আধুনিক কাপ্তেনের স্থলাভিষিক্ত ছিল।

(গ) **মিরবহর**—ইনি নৌকার প্রধান কর্ম্মচারী (Admiral তুঃ) ছিলেন। নামটী আরবী (আমির—আল্—বহর) হইলেও এইরূপ পদস্থ কোন ব্যক্তি যে প্রাচীনকালেও নৌবহরে আবশ্যক হইত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

(ঘ) **সূত্রধর**—কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজে এই ব্যক্তির যে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। মধ্যযুগে য়ুরোপীয় কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজগুলিতেও সূত্রধর অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

(ঙ) **কর্ম্মকার**—প্রয়োজনানুসারে কর্ম্মকারও নৌকায় থাকিত।

(চ) **ডুবারী**—ডুবারী প্রতি সমুদ্রগামী জাহাজেই থাকিত, কেননা অনেক সময় নৌকা জলপথে আটকাইয়া যাইত তখন ডুবারী ডুব দিয়া নৌকার তলদেশ পরীক্ষা করিত।

(ছ) **পাইক**—তরীগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গে পাইক বা সৈন্য থাকিত। অনেক মান্দ্রাজী (তামিল) এই কাজে নিযুক্ত হইত। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" আমলেও প্রচুর মান্দ্রাজী সৈন্য বাঙ্গালায় ছিল। জলপথে দস্যুভয় প্রবল ছিল বলিয়াই তরীসমূহে সৈন্যদলের প্রয়োজন হইত। মুসলমান আমলে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্য হইতে সংক্ষেপে প্রাচীন বঙ্গের নৌসম্পদের

কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। ইহার মধ্যে, অনেক স্থলে কবির নিরঙ্কুশ কল্পনার অভিব্যক্তি থাকিলেও, সেকালের নৌবহর ও বহির্বাণিজ্যের একটি সুন্দর চিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। বোধ হয় ইহা অবহেলার যোগ্য নহে।

বাঙ্গালীর অস্ত্রশস্ত্র

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে উদ্দাম কবিকল্পনার মধ্যেও বাঙ্গালীর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা অবহেলার যোগ্য নহে। কবিগণের অনেকেরই অভ্যুদয় মুসলমানী যুগে হইলেও প্রাচীন হিন্দু আমল হইতেই যে বাঙ্গালী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা তাহার স্পষ্ট আভাষ দিয়াছেন। এই সব কবিগণ যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের নাম দিয়াছেন তাহা সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেরই অনুকরণমাত্র বলিয়া মনে হয় না। যে সব লেখকগণ দীর্ঘকাল হইতেই বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচাইবার মানসে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরাজি হইতে বাঙ্গালীর রণকুশলতার বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। এইহেতু আমরা তৎপক্ষে মনোযোগী হইলাম। প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে যেগুলির নাম বাঙ্গালী কবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকটী এই :—পরশু, যমধার, নেঙ্গা, শক্তি, শেল, শূলফী (শূল), রায়বাঁশ, কার্ম্মুক, ভূষণ্ডী. তোমর, মুষল, মুদ্গর, খেটক, পাশ, চক্র ও অঙ্কুশ। এতদ্ভিন্ন সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল। কবি যে আগ্নেয়াস্ত্রের নাম দিয়াছেন তাহা মুসলমানী আমলের। ইহার নাম 'তবক' ও 'বেলক'। নিম্নে উল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :—

পরশু[১] :—পরশু এক প্রকার কুঠার বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশেও পূর্ব্বকালে ইহার খুব ব্যবহার ছিল। 'টাঙ্গী' নামক একপ্রকার অস্ত্রের এক সময়ে এতদ্দেশে খুব প্রচলন ছিল। উহা পরশুরই প্রকার ভেদ। এতদ্ভিন্ন 'ডাবুশ' ও 'পরশ্বধ' নামক অস্ত্রদ্বয়ও পরশুর অনুরূপ ছিল।

যমধার[২] :—সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'যমদ্রংষ্ট্র' নামে একপ্রকার অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী কবির 'যমধার' বোধ হয় উহাই। যমধার একপ্রকার অসির নাম। ইহার দুই দিকেই ধার ছিল। একপ্রকার যমধারের নাম ছিল 'পট্টিশ'। যুদ্ধে যাইবার সময় কেহ দুইখানি কেহ বা তিনখানি যমধার কোমরে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন। প্রাচীন রোমক সৈন্যগণও বাঙ্গালী সৈনিকের ন্যায় একরূপ দোধারি তলোয়ার ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে ট্রাজান স্তম্ভে অঙ্কিত চিত্র দ্রষ্টব্য। য়ুরোপে প্রাচীন মাইকেনিয় যুগেও এইরূপ তরবারির ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহা লৌহনির্ম্মিত না হইয়া পিত্তলনির্ম্মিত হইত। সুবিখ্যাত মাসিডোনিয় 'ফ্যালাঙ্কস্' সৈন্যদলেও এরূপ দুমুখো তরবারির ব্যবহার ছিল।

শূল :—প্রাচীনকালে রণক্ষেত্রে শূলের বিশেষ ব্যবহার ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নানাপ্রকারের হইত। ক্ষুদ্র আকারের একপ্রকার শূলের নাম 'নেঙ্গা'[৩] ছিল। এই নেঙ্গার

---

১ "ডাবুশ, পট্টিশ, পরশু, পরশ্বধ. থরতর বরিখে ভুরি।—রামেশ্বরের শিবায়ন, পৃঃ ৬৫।

২ যমধারের জন্য রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৫৪ সংখ্যক পুথির ২—১২ পত্র দ্রষ্টব্য। পরশু ও পট্টিশের ব্যবহার সম্বন্ধে রামেশ্বরের শিবায়ন, ৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ "ডানি হাতে নিল নেঙ্গা বাম হাতে বাঁশ" (রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৫৪ সংখ্যক পুথি, পত্র ১৩)।

ব্যবহার এখনও পূর্ব্ববঙ্গে আছে। শূলের তিনটী মুখ হইলে তাহাকে 'ত্রিশূল' বলে ইহা সকলেরই জানা কথা। নেঞ্জা ডান হাতে নিয়া ব্যবহার করিতে হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের মধ্যে এই প্রকার এক অস্ত্র আছে তাহার নাম 'আসেগাই'। নেঞ্জা শস্ত্র নহে, একপ্রকার অস্ত্র। ইহা ক্ষেপণ করিবার প্রথা ছিল।

রায়বাঁশ[১] :—বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালীর বাঁশের লাঠির খুব সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন ও তাহার লোপে বিশেষ ক্ষোভও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহা খুব যথার্থই হইয়াছে। বাঙ্গালী যে বাঁশের লাঠির সাহায্যে সেকালে অনেক যুদ্ধ জিতিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্তও ধনমান ও মর্য্যাদা কিয়ৎ-পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছে সেই বাঁশের নাম রায়বাঁশ। পূর্ব্বে ডান হাতে নেঞ্জা ও বাম হাতে রায়বাঁশ নিয়া যুদ্ধ করিবার প্রথা ছিল।

কার্ম্মুক :—বাঙ্গালীর তীরধনুক বা কার্ম্মুক অন্যান্য দেশেরই ন্যায় একটী প্রধান অস্ত্র ছিল। তীর রাখিবার আধার তূণীরকে 'তরকচ'[২] বলিত। একপ্রকার তীর ছিল তাহার নাম 'চিয়াড়'[৩]। যদিও 'চিয়াড়' বলিতে সাধারণত চারফলা তীর বুঝাইত তথাপি দুই ফলার অধিক হইলেই সেই তীরকে চলিত কথায় 'চিয়াড়' বলিত। দুই ফলার তীরকে 'দোয়াড়'[৪] বলা হইত।

১। 'বাজন নূপুর পায়, বীরঘটা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৯৪।

২। "তীরসহ তরকচ তুরিতে বান্ধে ভাল" (রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল, ১৩ পত্র)।

৩। "চকচক চিয়াড়ে পাটন পাঁচশির"—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ২৫২।

৪। "দোয়াড়, চিয়াড়, বাণ, করবাল খরশান"—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃঃ ৯৬।

ভুষণ্ডী[১] :—প্রাচীন কাব্যে আর একপ্রকার অস্ত্রের নাম পাওয়া যায়, উহা 'ভূষণ্ডী' অথবা 'মুষণ্ডী'। উহা দৈর্ঘ্যে তিন হস্ত পরিমিত হইত এবং একপ্রকার মুগুরবিশেষ ছিল। ইহা অস্ত্রশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল কারণ ইহা সজোরে ঘুরাইয়া শক্রর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হইত। একপ্রকার ভূষণ্ডীর নাম ছিল 'ভিন্দিপাল'।

শক্তি[২] :—আর একপ্রকার অস্ত্রের সেকালে খুব প্রচলন ছিল তাহার নাম 'শক্তি' বা 'শেল'। ইহাও একপ্রকার শূল। ইহার দৈর্ঘ্য দুই হস্ত পরিমিত হইত এবং একদিকে ধাতু নির্ম্মিত সিংহের মুখের আকৃতি করা হইত। দেখিলে বোধ হইত, যেন সিংহটী থাবার উপর ভর করিয়া হাঁ করিয়া আছে। এই অস্ত্রের গতি বক্র ছিল। এই হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার 'বুমেরাং' অস্ত্রের সহিত ইহা কতকটা তুলনীয়। নিক্ষেপ করিলে শক্তির গতিবেগ ভয়ানক হইত।

তোমর[৩] :—সেকালে এক শ্রেণীর অস্ত্র ছিল তাহার নাম ছিল 'তোমর'। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও মাথার দিকটা ধাতুনির্ম্মিত হইত। মাথার দিকটি কতিপয় ফুলের সমষ্টির ন্যায় দেখাইত। ইহা তিন প্রকারে ঘুরান হইত। তোমরের ন্যায় আর দুই প্রকারের অস্ত্র ছিল। ইহাদের নাম 'জাঠা' ও 'সাবল'।

মুদ্গর[৪] :—যুদ্ধে 'মুদ্গর' বা 'মুগুরের' খুব ব্যবহার ছিল। মুদ্গর দৈর্ঘ্যে তিন হস্ত পরিমিত হইত। ইহা খুব ঘুরাইয়া

১। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৭৫।

২। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৭১ ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ১৫৬।

৩। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, পৃঃ ৯৪।

৪। রামেশ্বরের শিবায়ন, ৬৫ পৃঃ।

শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হইত। ভারতবর্ষে যুদ্ধে সর্ব্বদা হস্তীর ব্যবহার ছিল। হস্তী অনেক সময় শুণ্ডে করিয়া মুদ্গর লইয়া শত্রু আক্রমণ করিত। এই মুগুরের সহিত প্রাচীন স্কান্দিনেভীয় দেবতা থরের হাতুড়ী অস্ত্র তুলনীয়।

খেটক[১] :—অসিযুদ্ধে ঢালের ব্যবহার স্বাভাবিক। পরিশুদ্ধ ভাষায় এই ঢালের নাম 'খেটক'। ইহাকে 'চর্ম্ম'ও বলিত কেননা গণ্ডারের বা মহিষের চর্ম্মে প্রাচীনকালে ঢাল প্রস্তুত হইত। ঢালের গাত্রে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত থাকিত।

পাশ[২] :—প্রাচীন কাব্যাদিতে 'পাশ' অস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদিতে ইহা বরুণদেবতার ও দেবী দুর্গার অস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাশ অস্ত্রই বোধ হয় কালে এতদ্দেশে ঠগীদের হস্তে গামছা বা রুমালে পরিণত হইয়াছিল। কোন সময়ে বহু লোক এই ঠগী বা 'গামছামোড়া'দের হস্তে প্রাণ দিয়াছিল।

চক্র[৩] :—'চক্র' অস্ত্রের বোধ হয় কোন সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল। সংস্কৃতগ্রন্থ ও শুক্রনীতি অনুসারে ইহার বর্ণ নীলের জলের ন্যায় এবং বেষ্টনী দশহস্ত পরিমিত ছিল। ইহা ৫ কি ৭ বার ঘুরাইয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হইত। কতিপয় শিখ সৈন্যদলে ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সৈন্যদলে এতদনুরূপ একপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার এখনও কিয়ৎ পরিমাণে আছে।

১। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ৭৫ ও ২৬৭ পৃঃ।

২। ঐ ৭১ পৃঃ। আমেরিকার বন্যজন্তু ধরিবার ফাঁস "ল্যাসো" তুলনীয়।

৩। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ৭১ পৃঃ।

অঙ্কুশ[১] :—হস্তীকে চালিত করিবার অঙ্কুশও কোন সময়ে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। অঙ্কুশের বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

গুস্তেভ অপার্ট নামক পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত দীর্ঘকাল এতদ্দেশে থাকিয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে এই সব অস্ত্রশস্ত্রের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অমূল্য। সংস্কৃত নীতি-প্রকাশিকা, রত্নমালা, শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারতোক্ত নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রের যে বিবরণ আছে তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালী কবি বর্ণিত এই সব অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কতিপয় অস্ত্রের ব্যবহার যে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ, ইহা শুধুই কবিসুলভ কল্পনা নহে।[২]

প্রাচীন বঙ্গে ভারতের অপরাপর প্রদেশেরই ন্যায় 'চতুরঙ্গ' দল যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। ইহা রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক দ্বারা গঠিত হইত।

কবিগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে এক সময়ে খুব ভাল ঘোড়া এদেশে আমদানী হইত। সুদূর পারস্য, তিব্বত, তুর্কীস্থান ও আরবদেশ হইতে এই সব ঘোড়া বঙ্গে আসিত। ভারতের মধ্যে সিন্ধুদেশ ঘোড়ার জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালী পদাতিকগণ নূপুর পরিয়া ও রায়বাঁশ হস্তে যুদ্ধ করিত এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহারা ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য গায়ে মাটি মাখিয়া লইত। ইহার নাম 'বীরমাটি' বা 'রাঙ্গামাটি' ছিল। ডোমগণ কোন সময়ে খুব দুদ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ইহাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিদেশী সৈন্যদের

১। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ৭১ পৃঃ।

২। মদ্রচিত 'Aspects of Bengali Society' (c. u.) নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

মধ্যে রাজপুত ও তেলেগু সৈন্যগণের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে রাজার সহিত বারজন সামন্ত নৃপতি যুদ্ধে যাইতেন।[১] এই প্রথা বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা ছিল। সব জাতির লোকই রণক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ করিত। এই সম্বন্ধে জাতি বিচার ছিল বলিয়া মনে হয় না। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে ইহার বেশ হাস্যজনক উদাহরণ আছে। যথা :—

"পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্যা।
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়া॥
কর্ম্মকার পাইক বলে করিয়া বিনয়।
বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম্ম নয়॥
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি।
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি॥
পলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পায়্যা।
আকুল হইয়া কান্দে মুখে হাত দিয়া॥
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা করি করে।
দন্তে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে॥
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে।
রক্ষ রক্ষ করি তারা বিনয়ত করে॥

—মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য, পৃঃ ৮২।

যে সামান্য কয়টী উদাহরণ এখানে দেওয়া হইল, আশা করি সেকালের বাঙ্গালীর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ইহা কিছুটা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

১। "বারভূঞা চলে ঘোড়া করিয়া তাজনী।
আচ্ছাদিত ধূলায় গগনে দিনমণি।"—ধর্ম্মমঙ্গল, রামচন্দ্র বন্দ্যো।

সেকালের বঙ্গনারীর অলঙ্কার

সব দেশেই মেয়েদের অলঙ্কার পরিধানের সখের চির প্রসিদ্ধি আছে। শুধু মেয়েদেরই এই সখ আছে, এইরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। পুরুষদের ভিতরেও আংশিকভাবে এই সখের অভাব নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদিম জাতিগুলির কথা এই উপলক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন অনেক সভ্যজাতির ভিতরেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই যথাযোগ্য গহনা পরিত। হিন্দু দেব-দেবীর গাত্রাভরণও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যাহা হউক পুরুষ-দিগের অলঙ্কার পরিধানের অধিকার থাকিলেও এই সম্পর্কে নারী জাতির বিশেষ রুচি ও অধিকার যে সর্ব্ববাদিসম্মত তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। সংস্কৃত সাহিত্য-কারগণ এই বিষয়ে এত সচেতন যে কাব্যকে সুন্দরী নারী কল্পনা করিয়া তাঁহারা কাব্য-সুন্দরীকে সাহিত্যিক অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন।

অলঙ্কার বা গহনাতে নারী জাতিরই বিশেষ অধিকার এবং ইহা তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্যেরও বর্দ্ধক বা পরিপোষক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অলঙ্কার পরিধানের অপেক্ষা রাখে না, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুচি অনুযায়ী যথোপযুক্ত অলঙ্কার যে সৌন্দর্য্য বিকাশে সাহায্য করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রুচি ও সভ্যতার স্তরভেদে মানব জাতির ভিতরে যেমন সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা

আছে, তেমনই গহনার আকৃতি ও উপাদান সম্বন্ধেও বিস্তর বিভিন্নতা রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে যে কত প্রকার গহনার প্রচলন আছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই কঠিন। এই সব গহনা সাধারণ প্রস্তর, পশু পক্ষীর হাড়, পালক হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের ফুল ও ফল, সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য, শঙ্খ, কাষ্ঠ, মূল্যবান প্রস্তরাদি, মুক্তা এবং স্থলজ ও জলজ বহুবিধ উপাদানের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অলঙ্কার সম্বন্ধে আর সাধারণ ভাবে অধিক আলোচনা না করিয়া আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কালে অর্থাৎ প্রায় তিন শত কি সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বেও মেয়েরা কিরূপ অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার একটু পরিচয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে দিতে চেষ্টা করিব। এই প্রাচীন গহনাগুলির মধ্যে কিছু কিছু গহনা রূপান্তরিত অবস্থায় এখনও বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চলিতেছে।

মানুষের রুচি চিরকাল একরূপ থাকে না। সুতরাং আমাদের দেশের এখনকার মেয়েদের রুচিও আর পূর্ব্বের মত নাই। গহনার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন কালের মেয়েরা যে সব গহনা পরিধান করিয়া আনন্দ পাইতেন এখনকার মেয়েরা হয়তো তাহা পাইবেন না। এখন যুগধর্ম্মে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলনের ফলে, রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবুও আমরা আমাদের পিতামহী, প্রপিতামহী বা তাহারো পূর্ব্বেকার আমলকে একেবারে অগ্রাহ্য করিব কি? প্রাচীনকে অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমানকে ভালরূপে চেনা যায় না। আসলে বর্ত্তমান তো অতীতেরই বিবর্ত্তন মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সেকালের মেয়েদের অলঙ্কার

সম্বন্ধে এইস্থানে একটু পরিচয় দিতে যাওয়া সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহা যেমনই জীবন্ত তেমনই অনবদ্য। *

সেকালের বঙ্গনারীর বহুবিধ অলঙ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা, সিঁথি, বেশর, কুণ্ডল, চক্রাবলি, হিরামঙ্গলকড়ি, হার, গ্রীবাপত্র, অঙ্গদ, রতনচূড়, শঙ্খ, খাড়ু ও উজ্ঝটিকা। এইস্থানে একে একে ইহাদের কিছু পরিচয় দিতেছি।

১। **সিঁথি**—ইহা তিনটি স্বর্ণসূত্রের বা পাতের সমন্বয়ে নির্ম্মিত মস্তকাভরণ। এই অলঙ্কারটি অল্পবিস্তর এখনও এই দেশে প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। রাজপুতানায় ইহাকে 'শিরবন্দী' বলে।

২। **বেশর**—ইহা নাসিকার উপর পরিতে হইত। ইহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। পল্লী অঞ্চলের "নথ" নামক গহনা ইহারই প্রকারভেদ মাত্র।

৩। **কুণ্ডল**—ইহা একপ্রকার কর্ণাভরণ। প্রাচীনেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে এই অলঙ্কার পরিধান করিতেন। ইহা স্বর্ণনির্ম্মিত ও মুক্তাখচিত হইত। প্রাচীন একপ্রকার কুণ্ডলের নাম ছিল "মকর-কুণ্ডল"। ইহার আকারটি ছিল কাল্পনিক জলজন্তু মকরের মত। আধুনিক মাকড়ি, "ইয়ারিং" প্রভৃতিকে এই কুণ্ডলরেই আধুনিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। হিন্দু দেবতাদের মধ্যে নারায়ণ "কনক-কুণ্ডল-কিরীটী", "হারি" ও "কেয়ুরবান" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

৪। **চক্রাবলি**—ইহা প্রাচীনকালে ব্যবহৃত কানবালা

---

* এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মদ্‌রচিত "Aspects of Bengali Society" গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

বিশেষ। এই সুন্দর কর্ণভূষার তুইটি অংশ থাকিত। উপরের বৃত্তাকার অংশটীকে বলিত "চক্র", আর নিচের অংশটির নাম ছিল "বলি"। "বলি" অপেক্ষা "চক্র" আকারে ক্ষুদ্রতর হইত। "চক্র" বা "চাকিতে" মুক্তার নানারূপ সুন্দর কারুকার্য্য থাকিত। কানের উপরের অংশে "চক্র" এবং নিম্নাংশে "বলি" পরিধানের নিয়ম ছিল।

৫। **হিরামঙ্গলকড়ি**—এই গহনাটির অপর নাম "মদনকড়ি"। কড়ির ন্যায় আকৃতি এই স্বর্ণাভরণটিকে কর্ণের মধ্যভাগে পরিধান করিবার নিয়ম ছিল এবং ইহাতে অনেক প্রকার সূক্ষ্ম কাজ থাকিত।

৬। **হার**—সাধারণতঃ তিন প্রকার হারের নাম প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়। যথা,—"শতেশ্বরী" হার "সাতেশরী" হার ও একাবলী হার। শত লহর ও সাত লহর হারের প্রকারভেদেই প্রথম তুই শ্রেণীর হারের উদ্ভব হইয়াছিল। সেকালে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গলদেশে হার পরিধান করিত। প্রাচীন ধনী সম্প্রদায়ে উল্লিখিত তিন প্রকার হারেরই সমধিক আদর ছিল। ইহা ছাড়া নারীদের কটিদেশে ঝুলাইবার জন্য এক প্রকার অলঙ্কারকেও "হার" বলিত।

৭। **গ্রীবাপত্র**—এখনকার চিক ও হাঁসুলির স্থানে প্রাচীন কালের বঙ্গনারীগণ যে স্বর্ণনির্ম্মিত গহনাটি গলদেশে আঁটিয়া পরিধান করিতেন তাহার নাম ছিল "গ্রীবাপত্র" (সাধারণ কথায় পাঁতি)। সোনার পাতে নির্ম্মিত এই অলঙ্কারটি মুক্তাখচিত ও নানারূপ কারুকার্য্যখচিত হইত। বাঙ্গালাদেশে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার দেবমূর্ত্তির গলায় হাঁসুলির ন্যায় যে অলঙ্কার দেখা যায় উহাই "গ্রীবাপত্র"।

৮। অঙ্গদ—উভয় হাতের উপরের দিকে কনুই পর্য্যন্ত অংশের সব অলঙ্কারেরই সাধারণ নাম ছিল “অঙ্গদ”। ইহার কতিপয় প্রকারভেদ এই স্থানে দেওয়া গেল।

(ক) তাড়—বর্ত্তমান সময়ে “অনন্ত” নামক গহনা এই “তাড়” বা “তাড়ঙ্ক” নামক প্রাচীন গহনার স্থান অধিকার করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই “তাড়” পরিধান করিত। ইহা দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটি সোনার পাতে নির্ম্মিত হইত। তাড়ের প্রকারভেদ এখন “তাগা” নামে পরিচিত।

(খ) কেয়ূর—এই অলঙ্কারটিও স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে পরিধান করিত। ইহা খুব প্রাচীন অলঙ্কার। কেয়ূর গঠনে নির্ম্মাতার যথেষ্ট পরিশ্রম ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইত।

(গ) বাজু—ইহাকে “বাজুবন্ধও” বলিত। ইহার কিছু পরিচয় অদ্যাপি পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। স্বর্ণনির্ম্মিত পুরু পাতের উপর খোদাই করা নানারূপ কারুকার্য্যই ইহার বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) মাদুলি—এই অলঙ্কার প্রায় বাজুর ন্যায়ই দেখিতে হইত। এই গহনাটির এখনও কিছু প্রচলন আছে। ইহার সোনার পাত বাজুর সোনার পাত অপেক্ষা কম পুরু হইত, কিন্তু ইহাতে বাজু অপেক্ষা কারুকার্য্য বেশী থাকিত। মাদুলির অপর দুটির নাম “তাবিজ” ও “কবচ”। পূর্ব্ব-বঙ্গে “তাবিজ” নামটি প্রচলিত। দুই সারি মাদুলিযোগে “জসম” নামক অপর একটি অলঙ্কর এখনও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

হাতের উল্লিখিত গহনাগুলি পরিধান করিবার রীতি এইরূপ ছিল। প্রথমে হাতের একেবারে উপরের অংশে

মাদুলি, তাহার নিম্নে বাজু, তাহার পর ক্রমান্বয়ে তাড়, জসম এবং সকলের নিম্নে কেয়ুর পরিবার সাধারণ নিয়ম ছিল।

৯। **রতনচুড়**—উভয় হস্তের কব্জির উপর পরিধান করিবার একপ্রকার সুন্দর কারুকার্য্যময় হস্তাভরণ। ইহার তিনটি ভাগ থাকিত। গহনাটির উপরের অংশের নাম "সরল", মধ্য অংশের নাম "চূড়" এবং নিম্নের অংশের নাম "কঙ্কণ"। কঙ্কণের অপর দুইটি নাম "বলয়" বা "বালা" হইলেও "কঙ্কণ" ও "বলয়" স্বতন্ত্র গহনা হিসাবেও সময় সময় গণ্য হইত। বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত একপ্রকার বলয়ের নাম ছিল "বাহুটি"। "চূড়" এবং কঙ্কণ" স্বতন্ত্র অলঙ্কার হিসাবে পরিধান করিবার রীতি এখন বিশেষ প্রচলিত। "সরল" নামক অলঙ্কারটি মুক্তাশ্রেণীসমন্বিত অথবা মূল্যবান প্রস্তর-খচিত হইত। নানারূপ কারুকার্য্যের মধ্যে পুষ্পের কারুকার্য্য "চূড়ে"র বিশেষত্ব ছিল। "বলয়ে"র মধ্যের নানারূপ কারুকার্য্যও উল্লেখযোগ্য ছিল।

১০। **হাতপদ্ম**—হাতের পাতার উপরের দিকের অলঙ্কার বিশেষের নাম ছিল "হাতপদ্ম"। এই অলঙ্কারটি কঙ্কণের সহিত অন্ততঃ দুইটি স্বর্ণসূত্রে যুক্ত থাকিত এবং প্রচুর কারু-কার্য্যই ইহার বিশেষত্ব ছিল। একটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের মধ্যভাগে একটী মূল্যবান ও বড় "নীলা" প্রস্তর বসাইয়া এই মনোমুগ্ধকর অলঙ্কারটি নির্ম্মিত হইত।

১১। **শঙ্খ**—শঙ্খ বা শাঁখার ব্যবহার খুব প্রাচীন এবং হিন্দু পরিবারের প্রাচীন রীতি অনুসারে ইহা সধবা নারীকে অবশ্য পরিধান করিতে হয়। পূর্ব্বে এ দেশে তিনপ্রকার শঙ্খের খুব প্রচলন ছিল। ইহাদের নাম

লক্ষ্মীবিলাস "শঙ্খ", "মুঠ" শঙ্খ ও "কুলুপিয়া" শঙ্খ। শেষোক্ত অর্থাৎ "কুলুপিয়া" শঙ্খের নামটি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে ইহা কুলুপের ন্যায় কাঠি দিয়া হাতে আটকান হইত। দুই ভাগে ভাগ করা যায় এরূপ কুলুপিয়া শাঁখার প্রচলন এখনও প্রচুর রহিয়াছে। "মুঠ" শঙ্খ ও "লক্ষ্মীবিলাস" শঙ্খের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতে যথেষ্ট রহিয়াছে। এক সময়ে অবস্থাপন্ন পরিবারে ইহাদের খুবই সমাদর ছিল।

১২। **মগরখাড়ু**—ইহা রৌপ্যনির্ম্মিত খাড়ু বিশেষ। কোন সময়ে ইহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। পায়ে ব্যবহার্য্য এই গহনাটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরিধান করিত। আর এক প্রকার খাড়ুর নাম ছিল "মল্লতোড়ড়"। সেকালে মল্লগণ যুদ্ধে যাইবার সময় এই খাড়ু পরিধান করিত। পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত "মল" নামক পায়ের গহনাটি খাড়ুর প্রকারভেদ মাত্র। এই "মল" প্রাচীন মল্লগণকেই স্মরণ করাইয়া দেয় কিনা কে বলিবে? সেকালে এক প্রকার মলের নাম ছিল "বঙ্করাজপাতা" বা "বাঁকাপাতা মল"। এক সময়ে ইহার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে মল্লগণ বা পদাতিক যোদ্ধাগণ (পাইকগণ) খাড়ু ভিন্ন পায়ের অন্য প্রকার গহনা "নূপুর" বা "বাজন-নূপুর" পরিধান করিয়াও যুদ্ধ করিতে যাইত। বহু পাইক চলিবার সময় "বাজন-নূপূরের" মনোরম ধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যাইত। মেয়েদের পায়ে ব্যবহৃত নূপুরের অপর একটী নাম ছিল "কটক"। "কটকে"র সহিত একটী রত্নখচিত থোপ থাকিত, তাহাকে বলিত "রত্ন-মঞ্জরী"।

(১৩) **উজ্ঝাটিকা**—ইহার অপর প্রাচীন নাম "উঞ্চট", বর্ত্তমান নাম "পাশুলি" বা "চুট্‌কি"। ইহা পায়ের অঙ্গলিসমূহে

পরিধেয় অলঙ্কার বিশেষ। এক সময়ে রত্নখচিত উষ্ণটিকার নারী সমাজে খুব সমাদর ছিল।

নানারূপ মূল্যবান প্রস্তর বা রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা প্রভৃতি নির্ম্মিত বঙ্গের কারুকার্য্যময় এই সব প্রাচীন ও মনোরম অলঙ্কার এক সময়ে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার অভ্যন্তরে সুদূর পল্লী অঞ্চল খুঁজিলে এখনও ইহার কিছু নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। বিশেষ করিয়া পুরাতন চিত্রপটে এবং প্রাচীন দেবমূর্ত্তির গাত্রের অলঙ্কারের মধ্যেও ইহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই সব অলঙ্কার বাঙ্গালার প্রাচীন কারুশিল্প ও সংস্কৃতির আংশিক আভাস দিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা মূল্যবান তথ্যের ভিতরে সেকালের বঙ্গনারীর অলঙ্কার সম্বন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য বিবরণ রহিয়া গিয়াছে। এইস্থানে সামান্য কয়েকটি উদাহরণসহ মাত্র কতিপয় অলঙ্কারের বর্ণনা দেওয়া গেল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এই সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

শব্দ-সূচী

খ

গ

দ্বিতীয় খণ্ড

STUDIES IN OLD BENGALI LITERATURE

RELIGIOUS CULTS AND LITERATURE OF MEDIÆVAL BENGAL

Religion has always been the guiding force in all spheres of activities, literary or otherwise, of the people of Bengal. Never before in her history had it been discernible better than in the Mediaeval Period (i.e., 13th-18th centuries)[1] when the Bengali literature, specially its poetry branch,[2] reached a high stage of development unparalleled in any other epoch. The impetus given by various local cults developed our literature to an amazing degree owing to a large number ot poets composing laudatory verses, each of them writing in honour of the deity he worshipped. Thus arose our Sivāyana and Mangal-Kāvyas which are purely indigenous in character, not to speak of two other branches of literature, *viz.*, metrical Bengali translations mainly of the Rāmāyana, the Mahābhārata and the Bhāgavata and the Vaisnava Literature with its wealth of historical writings and unique lyrical productions. It was in the peculiar faith in God and the Brahmans and the resignation of the people to them (as

[1] It should be noted that the Mediaeval Period in Europe began in the latter part of the 5th century and ended in the middle of 15th century A.D. while in Bengal the Mediaeval Period properly speaking began with the advent of the Mahomedans in Bengal in 1199 A.D. (conquest of Navadwip by Md. Bin Bakhtyar Khilji) and ended in the middle of the 18th century (Battle of Plassey), if we fix any arbitrary date.

[2] Mediaeval Bengali Literature deals almost wholly with metrical Bengali. Prose literature, so to speak, really started right earnestly with the establishment of the Fort William College at the beginning of the 19th century.

exhibited in the indigenous literature of this period) as well as the patronage of the foreign rulers extended to our literature, that the Mediaeval Period differed so much from the Ancient Literary Period. In order to ascertain the significance of the literary activities of the people it is proper to study the various cults which existed in Bengal in the period mentioned above and so these Bengal cults are described here cursorily.

The religious activities of the period may be divided into two classes, *viz.*, (1) Buddhistic and (2) Paurānik. It should be noticed, howevei, that no rigid line of demarcation can be drawn between these two, as often enough both Buddhism and Pauranik Hinduism existed side by side, sometimes with amity and rarely with discord.[1] However, Buddhism being then in a decadent stage Paurānik renaissance imprinted its deep mark clearly on the Buddhistic cult and the literature which progressed as the Moslem rule advanced in Bengal.

Degenerate Tāntrikism prevailed in Bengal after the fall of Buddhism in the 9th and the 10th centuries. Tāntrikism pure and simple had some scientific background. However much pure originally it had been, it degenerated in later days when it sanctioned hideous performances and repulsive debaucheries of all sorts.[2]

The Bengali literature was at one time full of mystic tāntrik sayings very difficult to understand. Ḍāk-Tantra, popularly known as Ḍāker-Vachan contains many such passages which are not easy to comprehend. In Goraksha-Vijaya (pp. 188-195)

---

[1] See Nirañjaner Rusmā, Sunya Purāṇa.

[2] See Narottam Vilās, Canto VII.

may be found very abstruse tāntrik ideas in the garb of queries and answers. It is very peculiar that the tāntrik mysticism, which seems to us so difficult to understand now, was not considered so, even by the common people of the early Mediaeval Period. This may be guessed from the extensive prevalence of the tāntrik ideas in the literature of the period, such as, Goraksha-Vijaya, Minchetan, Sunya-Purāṇa, Mayanāmatir Gān and similar other works. This Tāntrikism, in course of time, commingled with all the cults of the mediaeval Bengal, whether Buddhistic or Pauranik.

(A) Buddhistic Cults.

(1) The Dharma Cult.

The degenerate Tāntrik-Buddhistic cult of the Mahāyāna school was known in this country, according to some, as the Dharma cult. Whether this cult was really Mahāyāna Buddhism itself with a changed name or quite a separate local cult with Buddhistic stamp only, we cannot finally say. The former is an old theory while the latter is a new one with staunch believers on both sides. It is most peculiar that traces of the Dharma cult are only to be found in West Bengal and not in the East or North Bengal. The earliest treatise on the cult, *viz.*, Sunya-Purāṇa by Rāmāi Pandit perhaps belongs to the 10th-11th century A.D.[1] and contains very early fragments of Bengali Prose. That the cult was considerably Buddhistic

[1] The date is a disputed one, especially with a view to the fact that almost the only extant manuscript raises suspicions of interpolations of a much later period.

is evident from such lines of the Sunya-Purāṇa as "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" (the god Dharma speaks ill of the sacrificial rites) and "শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান" (the god Dharma is much respected in Ceylon). That the Tāntrikism of a degenerate kind entered into it may be proved from the rites enjoined in the " Dharma-Puja Paddhati". In the tāntrik worship self-mortification is predominant. The " Sādhaka " (the votary) sometimes gives up his own head to the object of worship but such instances are not found in pure Buddhism where ' Himsā ' of any kind is disallowed. We find a devout worshipper like king Bhumichandra sacrificing his own head to his object of worship, the god Dharma. Another grotesque example is found in the repulsive cooking of a prince's (Luichandra's) flesh by his dear mother Madanā herself. This was done to satisfy the god Dharma in the guise of a Brahman guest. This latter story, to be found in the Dharmamangal poems (see Ghanaram, p. 38), reminds one of Prince Briṣaketu's story as contained in the Mahābhārata.

(2) The Sahajiyā Cult.

The Sahajiyā cult which arose from Tāntrik Buddhism was a most peculiar feature of the religious annals of Bengal. It was based on such tantras as Mantrajān, Bajrajān, and Kālachakrajān all being generally known as Sahajāmnāya. Some Tantras written in Bengali have been recovered by MM. Dr. Haraprasad Sastri from Nepal. These are Vajra-Dāk-Tantra, Charyā-Charya Vinischaya, Vodicharyyāvatāra, and others. The tantras mentioned here belonged to the particular

creed known as "Sahajāmnāya" as mentioned above, and became, in course of time, popularly known as the Sahajiyā. Kanu Bhatta, the writer of the "Charyā-charya-vinischaya," was the earliest Sahajiyā Buddhistic writer on the subject. From Kanu Bhatta's writings it may be imagined that the Sahajiyās tried to attain perfection through the satisfaction of their carnal desires. According to them these passions are natural to human beings and as such they sought perfection through them (*vide* Sastri's newly discovered Tantras from Nepal). The Sahajiyās were once much hated as it seems from the epithet "বৌদ্ধপাষণ্ড" given to them by the people. (See Mālatimādhava, Prabodh-chandrodaya and some other Sanskrit Dramas.) The Vaisnava Sahajiyā was a later development and Chandidas was its greatest apostle. Many of his lines sparkle with a very sublime idea[1] which is the essence of Vaisnava Sahajiyā though not of the Buddhistic Sahajiyā. Love for a woman and especially for one who is not one's wife is the cardinal principle of the Sahajiyā cult. According to this theory pure love can only be possible between the pair who are not connected in society as husband and wife. To attain such a love one must experience

1 (*a*) "সহজ সহজ সবাই কহয় সহজ জানিবে কে।
কলঙ্ক সাগর যে হইয়াছে পার সহজ জেনেছে সে॥"
চণ্ডীদাস।

(The word "Sahaj" is on everybody's lips but who can realise its proper significance? He who has crossed the sea of 'Kalanka' i e. ill-repute has really been able to understand it.)—*Chandidas*

(*b*) "কোটিতে গোটিক হয়।"—চণ্ডীদাস।

(Among a crore of so-called Sahajiyās only one may be found to be the real one.)—*Chandidas.*

all the earthly pangs and sufferings (কলঙ্ক) like a martyr. Such love is " Parakiyā " which is, according to the Sahajiyās, more fine and selfless than "Swakiyā," *i.e.*, that between a husband and his wife, the connection being imposed upon the pair by society. The lines of Chandidas—

"শুনহে মানুষ ভাই
সবার অধিক মানুষ বড়,
তাহার অধিক নাই ॥"

("Listen to me, oh man. Man stands supreme over all and no other creation is superior to him)—show in what high respect man as man was regarded by Chandidas.

This Sahajiyā cult gradually degenerated and became a vehicle of illicit relations between the Vaisnavas of opposite sexes known as the " Neṛa-Neṛis " (shaven-headed beings), the name being adopted from the Buddhist monks and nuns who used to shave their heads.

The Sahajiyā literature composed of Ānanda-bhairab, Amrita-ratnāvali, Amrita-rasāvali, etc., forms a very considerable portion of the Vaisnava literature and numerous tāntrik theories are mixed up with it.

According to some scholars,[1] the modern Sahajiyā (Vaisnava) doctrine of Bengal is distinctly Post-Chaitanya in origin. A belief has somehow gained ground that it originated from the Buddhist Sahajiyā doctrine; but this theory is based on imperfect knowledge of the spirit and principles of the Vaisnava Sahajiyā doctrine. People generally

[1] *Vide* Post-Chaitanya Sahajiyā Cult of Bengal by M. M. Bose.

speak of the Sahajiyās as members of a sect, who do nothing else but observe mystic practices with 'Parakiyā' women. In this aspect of culture, which may properly be called the later form of tāntrikism, the Sahajiyās have undoubtedly many things similar to those advocated by the Buddhist Sahajiyās. But the spirit of the two cults are quite different. Whereas the Vaisnava Sahajiyās culture love in the company of women, the Buddhist Sahajiyās cultivate knowledge being associated with women as "Uttar-Sādhikās". The real truth is that the idea of the culture of love can scarcely be traced in the literature, either of the Buddhist Sahajiyās or the tāntriks. The latter cultivated Sakti and the Buddhists sought Jnāna; but the Vaisnavas cultivated love and this is the distinguishing feature of the modern Sahajiyā doctrine of Bengal. This idea of love in the domain of religion was vehemently preached in Bengal by Chaitanya and the Sahajiyās also adopted love as the object of their culture. This is the essential feature of the modern Vaisnava Sahajiyā doctrine.

(3) The Nātha Cult.

Nāthism was another peculiar cult of the period. It was a cult of saint-worship and followed by the Yogis—a caste once occupying rather a high position, but now degraded. The Saints or Gurus such as Minanath, Gorakshanath, Kālupā, Hāṛipā and others were once much esteemed by these Yogis (see Mayanāmatir Gān, Gopichandrer Git, Mānikchandra Rājār Gān, Goraksha-vijaya, Min-chetan, etc., etc.).

The followers of Nāthism might be partly

Buddhistic as they also worshipped the God Dharma who might be, if not Buddha himself, very much Buddhistic in character. (See Mayanāmatir Gān and Mānik Chandra Rājār Gān). Saivism and Nāthism have also much in common especially when we see the Nātha Guru Minanath to overhear the mystic knowledge that was going to be imparted to Gauri, Siva's consort, by the god Siva himself (see Goraksha-vijaya). Affinity between the two cults might still be seen in Nepal.

(B) The Pauranik Cults.

(1) The Vaisnava Cult.

The Paurānik Hindus are divided into five groups, *viz.*, the Gānapatyas, the Sauris, the Saivas, the Sāktas and the Vaisnavas. Of these five, the followers of the god Ganapati as a separate group do not exist in Bengal. Of the other four, only traces of the Sun-worship (by the Sauris) are to be found in Bengal. These may be gleaned from the peculiar rhymes in the Bratakathās, chiefly current in Backerganj side. Among the remaining three, the Vaisnavas received great impetus at the hands of Chaitanya whose sublime teachings imparted a new lease of life to the religious fervour of the Bengali people. It was at the hands of his companion Nityananda and his (Nityananda's) son Birchandra that the Vaisnava cult received a new interpretation and the Vaisnava sect was really built up. Chaitanyism gave the Bengal Vaisnavas the name of " Gauṛiya Vaisnavas " (a new type of Vaisnavas) and the historical-biographical works, *viz.*, Chaitanya-Bhāgavata, Chaitanya-Charitāmrita, Bhaktiratnākar and

Prembilās, besides a host of other valuable writings, are living monuments of the intellectual progress of the community. Besides the lyrical productions, the Padas of Chandidas, Jnanadas, Balaram Das, Govinda Das and a number of other Padakartās stand incomparable in the annals of the literature of the world. Vaisnavism not only stood against caste-orthodoxy and revolutionised the Bengali Hindu society but also produced a literature unique in every respect. However, the Vaisnava literature came out of social-religious reforms, while the translation literature (e.g., translations of the Rāmāyana, the Mahābhārata and the Bhāgavata) was the mainstay of the orthodox Hindu community and both the activities although almost simultaneous with the indigenous literature, around which clustered so many cults, came a bit late. The local cults chiefly fostered indigenous literature and thus originated the Sivāyanas and the Mangal-Kāvyas, the latter partly devoted to extolling the god Dharma, and partly or rather chiefly, adoring the goddesses of the Sākta cult. (The Dharma cult and the Dharmamangal Kāvyas have already been referred to.) Now, let us mention here the remaining two cults, viz., the Saiva and the Sākta (the others having been already described above)[1] and the literature peculiar to each of them :—

(2) The Saiva Cult.[2]

Between the Saiva and the Sākta cults the former is more ancient in Bengal. A time came

[1] Vidyonmāda-tarangini by Chiranjiva Bhattacharyya furnishes an excellent picture of different Hindu cults in connection with their religious controversies

[2] It is peculiar that though in each cult the principal deity was reverenced other subordinate deities were not ignored.

when the Saiva and the Sākta cults, though originally at loggerheads, compromised and Siva occupied the position of the husband of Sakti or Durgā. The Sunya-Purāna (10th-11th century A.D.?) incidentally refers to the god Siva and contains some fine devotional lines in this connection. Besides the Sunya-Purāna, a class of literature grew up around Siva known as the Sivāyana literature of which the Sivāyanas of Rāmeswar and Ramkrisna are the most famous. A word may be said about the conception of the god Siva in Bengal. With the rural poets Siva became the god of agriculture and lost all Vedic prestige. Owing to the action and reaction of mutual influences among the rival cults, Siva, was partly endowed with the attributes of the Buddha according to some, and thus we find Siva in meditation. According to some scholars Siva in the Vedic days was known as the fierce god Rudra. But it has recently been found out that Siva has no connection with the Vedic Rudra who was a different god. The worship of Siva was current among the Dravidian people (as with the Pamirians) in the Deccan, long before the introduction of the Aryan Pantheon—(See "Saivism and Vaisnavism"—Bhandarkar). Various vulgar attributes were sometimes given by the people to the god Siva and thus we get "হরপার্ব্বতীর কোন্দল" and "বাগ্দিনীর পালা". the god had two sides—one local and another Paurānik, in his nature. The attribute of inaction that the god Siva possessed owing to various influences, made the god lose all charm for the people, which resulted in the gradual elimination of the Saiva cult from any place of importance. The

downfall, perhaps, became more rapid with the advent of Islam in Bengal. Islamites thought they always found help from the Almighty and so did the followers of the Sākta cult, but Saivites never received any active help from their god which was one of the reasons for the rapid rise of the Sākta cult and the gradual elimination of the god Siva from any position of importance. Examples are not rare to prove this point from the Manasāmangal poems, where Chand, the devout follower of Siva, suffered so much without receiving any help from his god, whereas, the follower of Manasā and Chandi received immense help from their respective deities. (Vide the Manasāmangal poems and the Chandi-Kāvyas in which Behula, Srimanta, Kalketu and others secured immediate help from their respective goddesses in times of need.)

(3) *The Sākta Cult.*

The Sākta cult, though of hoary antiquity, could not at first make much headway in Bengal, as Saiva cult held sway upon the upper classes of Bengal Hindus while the Sākta cult was in vogue among the humbler ranks of the Hindus only and possibly in Non-Aryan homes. However, as regards antiquity, the Sākta cult perhaps ranks very ancient. There was a time when Sakti-worship was current amongst almost all the civilized and ancient nations. Traces of Sakti-worship have been discovered in the eastern side of the Mediterranean Sea. Dr. Evans found it in Crete. According to B. Mazumdar, the current non-Aryan Kumāri Puja of the Sambalpur District of Orissa has some-

thing to do with the Durga Puja of Bengal. The Sakti cult or mother-worship probably flourished at one time among the nomadic nations where marriages were hasty and the union of the couple was temporary owing to nomadic tendency. The child then could only know the mother and not so much the father. The goddesses Durgā and Tārā may have some Non-Aryan origin. (See p. 12, Introduction, Modern Buddhism.)

It is very peculiar that the Dharma worshippers did not usually take to the Paurānik Sākta Pujas with a good grace as is evidenced from the lines of Dharmamangal poems wherein the Sakti-worshipper Ichhai Ghosh of Dhekur is badly beaten by the Imperial army of Gauṛ headed by Lausen (the devout Dharma-worshipper). The story is significant enough for our present purpose. That the Sākta cult was introduced into the homes of the rich merchant community by the ladies of the house after much trouble and that their Saiva husbands were at first unwilling to accept it, may be learnt from a perusal of the Manasāmangal poems. Evidently the two cults of the Saiva and the Sākta were at first not on good terms (see Vidyonmāda-tarangini) and their rival position is lucidly exemplified in the Mangal-Kāvyas such as those of Chandi and Manasā, but curiously enough the two effected a compromise in later days, when Sakti became identified as the wife of Siva and the doctrine of 'Purusa and Prakriti' was brought forward for the support of this idea. Unlike Siva, Chandi, Manasā and other female deities, were very much active in helping their votaries when in distress. They were also no less active in their

jealousies and rivalries amongst themselves. (See Kavikankan Mukundaram's Chandi-Kāvya and Baṁsidas's Manasāmangal among other works.)

That the goddesses Chandi, Manasā and other deities of the Sākta cult, were afterwards brought to a footing of compromise may be inferred from the following lines about Manasā in Baṁsidas's Padmā-Purāṇ (Manasāmangal) :—

"যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা॥"

" There is no difference between you, oh mother of the world, and the goddess Durgā. You (Manasā) and Chandikā are one and the same goddess. There is not the least doubt about it."

This, in short, is a brief sketch of the more important cults of mediæval Bengal, which will incidentally show to what extent our Bengali literature is indebted to them and to what extent our society has been moulded by their mutual rivalries and jealousies.

MEDIÆVAL BENGALI LITERATURE

Bengali literature of the Mediæval Period has many characteristic features deserving of special notice. When we apply the term "mediæval" whether in respect of Bengali literature or in the field of Bengali politics, we mean that period which began with the decadence of the Hindu-Buddhist power and ended with the downfall of the Muslim supremacy, that is to say, roughly the period between 1199 A.D. (conquest of Navadwip by Muhammad Bin Bakhtiyar Khiliji) and 1757 A.D. (Battle of Plassey). This is, no doubt, markedly different from the European conception of mediæval epoch which begins with 476 A.D. (fall of the Western Roman Empire) and ends with 1453 A.D. (fall of Constantinople) or 1494 A.D. (discovery of America by Columbus).

If one asks what is the moving force behind Mediæval Bengali literature, we should at once answer—it is religion. Bengali literature of this period is mainly illustrative of Hindu religion and is written invariably in verse. It may conveniently be divided into three main sections according to the characteristic features which each of them holds. They are as follows:—

(1) The Indigenous literature.
(2) The Translation literature.
(3) The Vaisnava literature.

(1) The Indigenous Literatures.

The peculiar feature of this type is its intensely religious and national character which, perhaps,

no other branch of our literature can claim in equal proportion. Every locality of Bengal had, at one time, a deity of its own. This gave rise to numerous novel cults which, in their turn, were responsible for a large body of very popular laudatory verses. These poems may not have attained originally the status of literature, but they at least supplied incentive to later poets to write lengthy poems of considerable literary worth depicting not only the beneficent powers of particular deities but also incidentally the national life of the period. This literature may be sub-divided into two classes, *viz.*, (1) the *Sivāyanas* and (2) the *Mangal-kāvyas.*

So far as the spirit is concerned the *Sivāyanas* and the *Mangal-kāvyas* are essentially Bengali in character representing true rural Bengal unalloyed by any extraneous elements. As regards language it has grown more and more sanskritised with the passage of centuries, thus showing the influence of Brāhmanic ideals and culture.

A marked difference exists between the two subdivisions of indigenous literature, the *Sivāyanas* and the *Mangal-kāvyas,* as regards subject-matter. The *Sivāyanas* deal invariably with the fortunes and domestic life of the rural god Siva (later on identified with the *Paurānik* god of the same name to whom Buddha's attributes were added) while the *Mangal-kāvyas* deal with the fortunes of human beings whose sufferings were due to their want of belief in a certain deity whom they were afterwards compelled to worship. Moreover, in the *Śivāyanas* we do not meet with any devotee for whose sake the deity condescends to perform any

miracles, as is the case in the *Maṅgal* poems. The latter also contain almost invariably a *Bāramasi* and a *Chautisā* which are its peculiarly characteristic features. In common, however, both the types furnish us with true pictures of Bengalee domestic life which go to prove the purely national character of these poems both in their spirit and outward features. It is not clear why, with the exception of a brief reference to Śiva and his agricultural exploits in the *Śunya-Purāṇ* (11th century), we do not come across any mention of the god in a separate literature hallowed by his name, till we come down to about six centuries later (17th century), when the *Śivāyana* reached a high degree of perfection in the hands of Ramkrishna and Rameswar. It is difficult to explain the existence of this big gap stretching from the 11th to the 17th century.

The *Mangal-kāvyas,* however, flourished up to the middle of the 18th century and Bharat Chandra's *Annadāmangal* is perhaps the last great example of this particular type. But the poem which represents truly this kind of literature and characterises the decadence of the indigenous spirit and advent of the Sanskritic influence is Kavikankan Mukundaram's celebrated *Chandikāvya.* It depicts the Bengalee home in a wonderfully realistic way which has no parallel in other *Mangal-kāvyas.* Among the *Manasāmangal* poems the works of Bejoy Gupta, Baṁsidas and Narayan Dev, and among the *Dharmamangal* poems those of Ghanaram and Manik Ganguli attract our special notice for the wealth of poetry and information they contain.

(2) The Translation Literature.

When we speak of translation literature, we mean that kind of Bengali literature which grew up from translations of Sanskrit religious works. This literature falls chiefly under three heads, *viz.*,

(*i*) The *Rāmāyana.*
(*ii*) The *Mahābhārata.*
(*iii*) The *Bhāgavata.*

A word should be said as to the origin of this particular type. The Mahomedans conquered Navadwip from Raja Lakshman Sen (1199 A.D.). Henceforth, it seems, they gave more attention to the conquest of the land than to the study of the culture of the inhabitants. Thus, perhaps, about two centuries elapsed before the force of their iconoclastic tendencies was spent up. At last they found out that as they became settlers of the soil and were put by Providence into the position of rulers, it was more profitable for them to administer the land and its people with sympathy than to kill or oppress them. The internal administration of the country was naturally in the hands of the Hindus. It dawned in the minds of two Pathan Sultans, Husen Shah and Nasarat Shah (15th-16th century), that it was necessary for them to get some knowledge of the religious works of the Hindus and for that purpose to invite learned Sanskrit scholars to translate them into Bengali so that the Pathan rulers might understand them and compare them with their own *Koran.* The famous Sultan Husen Shah being backed by his officers and Zaminders (both Hindu and Mahomedan) did yeoman's service to our the then poor literature

by encouraging not only writers of indigenous literature but also men like Kavindra Parameswar, Srikaran Nandi and others to translate the *Mahābhārata*, the *Bhāgavata* and other Sanskrit works.

The Moslem rulers being primarily concerned with the political administration of the country the management of the Hindu society fell into the hands of its natural leaders, the Brāhmans. Due to the influence of the Brāhmans the *Paurānik* form of Hinduism with its Sanskritic ideals came into vogue and the Buddhistic ideals of society were gradually relegated to the background. Coupled with this, the endeavour of the Moslem rulers to befriend our literature helped Sanskrit culture to make much headway. Hence, in the field of literature, Sanskrit poetics and expressions as well as old Hindu heroes and heroines, began to predominate in a very large measure. So we see that indigenous Behulā, Rañjāvati, Lakhā, Sanakā, Phullarā, Chānd, Kālketu, Lāusen, Kālu and others had gradually to make room for Sitā, Sāvitri, Chintā, Gauri, Rāmchandra, Yudhisthir, Satyavān, Harischandra and others of *Paurānik* and epic fame. Faith in God and faith in the Brāhman caste were considered the highest virtues in this age and so it became the object of our literature to extol and illustrate these virtues.

Another factor, the Tantrikism with its mother-worship, was incorporated both in Buddhism and Hinduism, and although the tāntrik spirit is much more noticeable in the indigenous branch of our literature, it had none the less, some influence upon the Translation and the Vaisnava literature as well.

However, though we sometimes miss in Translation literature sturdy ideals like those we find in the indigenous, we have a consolation in the fact that we are indebted to Sanskrit influence for the wealth of fine expressions to be found in Bengali as well as for the welding up of the many races of Bengal into one whole nation.

(3) The Vaisnava Literature.

This branch of our literature has certain unique features. While Hindu society was being reconstructed in the 16th century according to orthodox views by giant intellects like Raghunandan and Translation literature was being produced as a result, under the patronage of Moslem rulers, the great Chaitanya brought about immense changes in society and literature by preaching the gospel of "Bhakti" or devotion. Consequently Bengali literature was strengthened to an unprecedented degree. In Translation literature Sanskritic stories and ideas were rendered into fine metrical Bengali while in Vaisnava literature Bengali was embellished by Sanskrit quotations. In language the introduction of *Brajabuli* and other partly exotic dialetcts enriched our language and vastly enhanced its expressive qualities. The Vaisnava literature with its many-sided activities inaugurated and enriched two new branches, *viz.*,

(*i*) Historical-Biographical literature.
(*ii*) Lyrical literature.

(*i*) *Historical-Biographical Literature.*

This particular literary type was absent (barring some genealogical records) until the advent

of the Vaisnavas. Chaitanya's life and activities, as well as those of other Vaisnava saints, furnished the devotees of the sect with a rich theme for biographical writings which they did not fail to utilise to the full. In these biographical works, the illustrious authors have given us much incidental description of contemporary Vaisnava society and thus have provided us with very helpful side-lights. Among the most prominent of such works may be mentioned *Chaitanyabhāgavata* (Brindabandas), *Chaitanyacharitāmrita* (Krisnadas Kaviraj), *Chaitanyamangal* (two works by Lochandas and Jayananda), *Bhaktiratnākar* (Narahari Chakravarti), *Premvilās* (Nityanandadas), and a *Kaḍchā* (Govindadas).

(ii) Lyrical Literature.

The Vaisnava lyrics are unique in the annals of Bengali literature and some of the pieces rank amongst the very finest in the whole range of world literature. These poems express very well the emotional side of the Bengali character and are saturated with the spirit of the Bhakti cult which found in the story of Radha and Krishna a very convenient and poetical vehicle for conveying the subtleties of its profound philosophy. Chandidas, Vidyapati, Jnanadas, Govindadas, Balaramdas and a host of other lyric poets (*padakartās*) embellished this type of our literature, and Chaitanya's life, teachings and God-vision gave it an unparalleled impetus. The dreamy beauty and ethereal melody of these *pada* songs with their subtle suggestion of more than earthly love have ever charmed and haunted the Bengalee mind,

whether ancient or modern. But, there is also a dark side to the picture. The mellow ideal of the cult of love, however beautiful in itself, could not but have an enervating influence on the Hindu society, which, as a result, began to lose heavily in the political chess-game against stronger and more unscrupulous antagonists. But all this notwithstanding, the good of Vaisnavism certainly outweighs its bad. When we remember that it was Vaisnavism that roused the country from the heavy stupor of degenerate tantrikism into which it has fallen, combating all the while courageously with the deep-rooted evils like caste-distinction—we shall think twice before burdening it with the numerous charges that are every now and then being levelled against it by a host of unsympathetic critics.

There are some other types I have not yet mentioned, *viz.,* (1) the *kulajis,* (2) the folk-tales, (3) and the ballads.[1] The genealogical records

[1] "As examples of indigenous poetry, the Bengali ballads occupy a unique position......Chronologically speaking, most of them are comparatively modern, but the earliest of them are to be traced to the early Pala-period, as we find mentioned in the inscriptions of Dharmapal and Mahipal .... Some of the folk-stories, published by the University, may be traced to the 10th century or earlier.

The poetic value of these ballads has elicited a high appreciation from the foremost European scholars and some of them, like the distinguished artists Mr. Rothenstein and Mrs. Hogman, have spoken of them very highly. In the opinion of the latter some of the ballads are superior in poetic merit to the masterpieces of Maeterlinck and Madame de Lafayette.

Rothenstein calls the heroines of a few of the Bengali ballads as figures of Ajanta fresco-paintings, endowed with life and clothed with the imaginative poetry of those wonders of Hindu art. According to Mrs. Hogman 'They deserve to be on the same shelf, as eternal classical masterpieces amongst the books that never grow old and in which each generation discovers new reasons to love them.'

(*kulajis*) were mostly written in Sanskrit. There are yet extant some written in Bengali, which deserve special notice as they speak much of contemporary history just as the Vaisnava biographical literature did. The connection with Sanskrit works tempts us to include them as adjuncts to Translation literature. As regards the folk-literature it may be said that they are precious heirlooms of the Bengalee nation. Some of them have come down from mouth to mouth from the dim past, with slight changes, and are valuable as an indicator of the cultural progress of our people. As for the ballads it may be asserted that some of them are old enough to trace their origin from the days of the Palas (*e.g.*, the Gopichand songs) though, doubtless, they were committed to writing in a subsequent period. There are, of course, some which are not so old, but contain a blend of both fiction and history. The ballads are extremely precious as they contain a good deal of high class poetry and seldom show any Sanskritic influence. In this respect they may be well compared with the Vaisnava lyrics, although the outlook of the former is mundane while that of the latter is essentially spiritual. Ballads are no doubt valuable assets of the indigenous literature and they contain far less court-influence than the *Śivāyanas* or the *Mangal-kāvyas*.

The following, necessarily meagre, list of the more important works will show the development

"Having no element of Hindu mythology or religious legend, these secular tales have a direct appeal for the Europeans who appreciate them more than Vaisnava poetry."—*Mym. Ballads* : D. C. Sen.

of Bengali literature from the 13th to the 18th century. It will be seen from the list that literary production is especially prolific in the 16th and the 17 centuries. Both the Vaisnava and non-Vaisnava (indigenous and translation) literatures began to progress just like two parallel lines, ending in the deterioration of both in the 18th century (the age of Raja Krishnachandra) and their final exit in the 19th due to the combined influence of the English missionaries and English administration. During the first years of the British administration the printing press, coupled with European incentive, was responsible for the production of large numbers of secular works[1] which marked the departure of the old era and ushered in the new.

A List of Some Prominent Works

13th Century.

Indigenous literature—

Manasāmangal by Kana Hari Datta ; *Manasāmangal* by Narayan Dev ; *Dharmamangal* by Mayur Bhatta ;

Chandimangal by Manik Datta ; *Chandimangal* by Dwija Janardana.

14th Century

Translation literature—

Rāmāyana by Krittivasa (age disputed—14th, 15th or 16th century?) ; *Mahābhārata* by Sanjaya.

Vaisnava literature—

Padas by Chandidas (age disputed)

15th Century.

Indigenous literature—

Manasāmangal by Bijay Gupta. (Completed the work in 1494 A.D. during Husen Shah's reign.) *Dharmamangal* by Govindaram Banerji ; *Dharmamangal* by Ruparam.

Translation literature—

Mahābhārata by Kavindra Parameswar (written between 1495-1500 A.D.) ;

[1] See Long's Catalogue.

Mahābhārata by Dwija Abhirama ; Mahābhārata by Srikaran Nandi ;

Bhāgavata by Maladhar Vasu (completed trans. in 1480 A.D.).

16th Century.

Indigenous literature—

Manasāmangal by Baṁsidas (later 16th century).

Chandimangal by Dwija Hariram ; Kavikankan Mukundaram (written 1577-1589 A.D) *Dharmamangal* by Manik Ganguly (written in 1547 A.D.)

Translation literature—

Rāmāyana by Sankar Kavichandra (later 16th century)

Rāmāyana by Dwija Madhukantha ; Ghanasyām Das. *Mahābhārata* by Ghanasyam Das ; Rajendra Das ; Nityananda Ghosh (early 16th century) ; Kasidas (late 16th century) : Gangadas Sen ; Chandandas Mandal

Bhāgavata by Madhavacharyya (early 16th century) ; Kavichandra ; Syama Das ; Raghunath Bhāgabatāchāryya ; Ramkanta ; Gauranga Das ; Narahari Das.[1]

Vaisnava literature—

Chaitanya Bhāgavata by Brindabandas. (Written in 1573 A.D.)

Chaitanya Charitāmrita (1582 A.D.) by Krishnadas Kaviraj. *Chaitanyamangal* by Lochandas ; by Jayananda. *Nityananda Baṁsamālā* by Brindabandas. *Padas* by Govindadas.

17th Century.

Indigenous literature—

Manasāmangal by Ketakadas Kshemananda (written in 1650 A.D.) ; Jagatjiban Ghosal (end of the 17th century). *Rambinode*. *Sivāyana* by Ram Krishna. *Chandimangal* by Krishnakisore Ray. *Dharmamangal* by Ramchandra Banerjee ; Ramnarayan

Translation literature—

Rāmāyana by Dwija Dayaram ; Krishnadas Pandit, *Mahābhārata* by Bisarad (written in 1612 A.D.) ; Dwija Srinath ; Vasudeb Acharyya ; Nandaram Das (brother of Kasiram Das) (written *Drona Parva* in 1660 A.D.) ; Poet Sāral (of Utkal) (mistakenly called Sāran) ; Krishnananda Vasu ; Dwaipayandas ; Ananta Misra ; Ramchandra Khan ; Dwija Krishnaram (*Aswamedh Parva* only) ; Trilochan Chakrabarti ; Rameswar Nandi. *Bhāgavata* by Kavisekhar ; Daivakinandan ; Haridas ; Abhiram Das ; Narasingha Das ; Achyutadas ; Rajaram Datta ; Dwija Parasuram.

[1] Though the *Bhāgavata* belongs to the Vaisnava literature we include it in Trans. Lit., for obvious reasons.

Vaisnava literature—

Karnānanda by Jadunandandas (1607 A.D.). *Premvilas* by Nityanandadas (written 1600 A.D., real date possibly later than 1640 A.D.). *Padas* by Jnanadas ; Govindadas (young man in 1600 A.D.) (older opinion for both of them—16th century, later opinion—17th century). Vaisnava *Padas* by Balaramdas.

18th Century.

Indigenous literature—

Sivāyana by Jiban Maitra (written in 1744 A.D.) ; Rameswar Bhattacharyya (1760 A.D.). *Manasāmangal* by Dwija Rasik (end of the 18th century) ; Jiban Maitra (middle of 18th century). *Chandimangal* by Bhabanisankar Das (written in 1779 A.D.) ; Jayanarayan Sen (first part of the 18th century). *Kālikāmangal* by Dwija Kalidas. *Dharmamangal* by Ghanaram Chakrabarti (written in 1713 A.D.), Sahadev Chakrabarti (written in 1740 A.D.)

Translation literature—

Bhāgavata by Sankardas ; Jiban Chakrabarti, Bhabananda Sen ; Uddhabananda *Rāmāyana*[1] by Adbhutacharyya (real name Nityananda), (written in 1742 A.D.) ; Dwija Lakshmana ; Dwija Bhabanidas, Jagatram *Mahābhārata* by Lakshmana Bandyopadhyaya.

Vaisnava literature—

Bhaktiratnākar by Narahari Chakravarti (written between 1716-1740 A.D.)

Bamsi Sikshā by Purusottam (written in 1710 A.D.)

---

[1] One of the best Rāmāyanas was written in the 19th century. It is Rāmrasāyana of Raghunandan Goswami, composed in 1830 A.D.

MUKUNDARAM AND OTHER POETS OF THE CHANDI-CULT

Religion has been the inspiring force and the motive power of our old poetry with the exception of some of the Ballads of the Eastern Districts which mainly deal with secular love. The growth and development of the poems of the Mother-cult in Bengal are due to the religious inspiration given by the Brāhmanic revival. The temple-compound has ever since been the centre of all our poetical activities. Poet after poet has sung of the glories of his favourite deity, actuated by a spirit of competition to excel his predecessors or meet the exigencies of some religious occasion. When one poet had sung a song which amused the audience and inspired them with devotional fervour during the three or four days of worship, the next poet in the succeeding year attempted to excel his work based on the materials supplied by earlier poems. Thus gradually each god and goddess had a number of poet-devotees who sought the aid of the Muse to compose a song to be sung in the temple-yard. This process went on till a high-water mark of success was reached by the last gifted poet who scaled a height inaccessible to others, and thus his poem became the crowning piece of a sacred song sung on the *pujah* occasion, having reached an unapproachable standard of excellence.

Thus, as in the case of the cult of Manasā Devi, Lakshmi Devi and others—the Chandi-cult started from small and crude beginnings in the

hymns, praises and episodes connected with her worship till the highest point of success was reached by Mukundaram. Even after Mukundaram some of the poets attempted to compose poems in honour of Chandi but such attempts were futile as they could not match the performance of the great poet of Damunya. To the credit of Jaynarayan, another poet, it should be said that his poem on Chandi Devi, written in the middle of the 18th century, is remarkable for its ornate style and other literary merits though it is by no means a match for the immortal poem of Mukundaram.

It should be observed that the subjects dealt in Mārkandeya Chandi and Mangal-Chandi are based on entirely different materials. The former is a Pauranik tale composed about the 2nd century A.D., in which we find the mention of the Cheta dynasty to which the monarch Khāravela of the Hāthigumphā inscription belonged. The mention of the Mauryas amongst the soldiers of the Daitya kings Sumbha and Nisumbha, also lead to the same conclusion about the date of the poem. Mangal-Chandi is a rural deity of hoary antiquity and owes nothing to classical inspiration. The story of Mangal-Chandi seems to be based on the two Purānas, *e.g.*, Brahmavaivarta and Vrihatdharma. From the 34th Chapter of the former we learn, among other things, that it was the god Dharma who first brought to the world the worship of Mangal-Chandi. In the 16th Chapter of the Uttar Khanda of the latter Purāṇa we find references to the stories of Kālketu and Dhanapati. But after all such mention of the stories may be a later interpolation, as it was found in a single

manuscript of the poem about 200 years old and is not borne out by any other evidence.

That the Mother-cult belongs to the hoary past may be gleaned from the history of various ancient nations. In Egypt the goddess Isis, in Assyria the goddess Ishtar, in Rome the goddess Anna Perenna are cases in point. In Crete an ancient goddess with a lion on either side was discovered sometime ago by Dr. Evans. This image is believed to belong to 3000 B.C. Even within India the Mother-cult comes down from a very ancient time. Thus the time-honoured worship of Koltevai among the Tamils in Southern India led Vincent Smith to attempt to identify her with the goddess Durgā. The aboriginal tribe of the Sabaras worshipped a goddess Parna-Sabari or Vindhya-Vāsini by name. In the Vedic period we get the name of Rātri Devi or Kāli[1] and find mention of her worship. In the Vājasaneyi Samhitā we get the name of Ambikā. She was represented as the sister of Rudra as Isis was of Osiris in ancient Egypt. In the Hiranaykesi Grihyasutra the name of Bhavāni is found. The name of Bhadra-Kāli is likewise found in Sānkhāyana Grihyasutra. The goddess Aṣṭa-Bhujā was worshipped with much *eclat* in various parts India in the 8th and 9th centuries. At the village of Prambanam in Bali several images of the deity of this period have been found. In Bengal and Orissa such images are numerous. Thus, traces of the worship of the Mother are found in various parts of the world and in India in particular, from very

[1] Rig-Veda, 10th Mandal, 2-3, 127th Sukta.

early times. Instances may be multiplied but there is no need of doing so.

It is well-known that the Mother in a variety of aspects kindred to Hindu conception was worshipped by the Mādhyamic sect of the Mahāyāna Buddhists. The familiar deity Prajnā-Pāramitā is one of these. Late Charuchandra Bandyopadhyay pointed out a passage in Manik Datta's Chandi-kāvya which shows that the speculative theory of creation of the god Dharma (according to him Buddhistic) had an important bearing on a similar theory, propounded by the devotees of the Chandi-cult of Bengal. The episode of Chandi's swallowing an elephant, according to him, was also taken from Buddhistic speculation and the words *Sunya* or the void, Ādyā, Dharma and Uluka and their associations with lotus and elephant probably indicated the analogous situation.

The earliest poet on Mangal-Chandi yet known to us was Manik Datta who flourished probably in the 13th century. If Dwija Janardana flourished in the same century it is probable that his diction was changed by some later poet, for, in spite of the conciseness of his poem, it shows almost perfection of the 'Payār' metre which we cannot expect in the 13th century. The earliest works dedicated to Mangal-Chandi were short but they gradually developed at the hands of later writers and became so elaborate that it took eight nights to be sung—a fact mentioned in Chaitanya Bhāgavata, accounting for the designation of "Aṣṭamangalā" that the poem has since borne.

We may mention the following poets of

Chandi-cult, besides (*i*) Manik Datta and (*ii*) Dwija Janardana:—

(*iii*) Madan Datta.
(*iv*) Muktaram Sen (poet of Sāradā-Mangal written in 1547 A.D.).
(*v*) Devidas Sen.
(*vi*) Sivanarayan Dev.
(*vii*) Kirtichandra Das.
(*viii*) Balaram Kavikankan.
(*ix*) Mādhavāchāryya (who wrote his poem Jāgaran in 1579 A.D.).
(*x*) Dwija Hariram (who probably wrote before Mukundaram).
(*xi*) Mukundaram Kavikankan (completed his Chandi-kavya in 1589 A.D.).
(*xii*) Jaynarayan Sen (who wrote his poem in about 1763 A.D.)
(*xiii*) Bhabanisankar Das (poem written in 1779 A.D.).
(*xiv*) Sivacharan Sen (a contemporary of Jaynarayan).

The poet (fourth in our list) Muktaram Sen wrote in a Sanskritic style of which a typical illustration is furnished by his description of Kālidaha where the merchant Dhanapati and his son Srimanta saw a goddess devouring an elephant.

The most famous poet on Mangal-Chandi was Kavikankan Mukundaram. We find another Kavikankan in the list of Mangal-Chandi poets. He was Balaram Kavikankan. Tradition says that Mukundaram drew his inspiration from this Balaram Kavikankan who was latterly cast into shade by the splendour of Kavi-

kankan Mukundaram's fame.[1] This tradition is supported by a line in one of the manuscripts of Kavikankan-Chandi–"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ" —(I bow to my predecessor and song-master Kavikankan).

The materials on which Madhavacharyya based his poem show a striking analogy with those of Chandikāvya by Mukundaram. It is certain they drew from the same source. It is not likely that Mukundaram directly owed anything to Madhavacharyya. Madhava wrote his poem in 1579 A.D. and Mukundaram finished his work in 1589 A.D. Though, therefore, the former is the earlier poet, yet considering the distance of the localities[2] inhabited by the two poets and the shortness of the interval in which the poems were written, it does not seem probable that Mukundaram was aware of the existence of Madhava's work. The striking agreement between the two poems is due to the fact that many poems on Chandi dealing with the same episodes had already been written in Bengal, and her very atmosphere was charged with the music and spirit of those poems, so that any poet who handled the subject in later times found abundant materials at his disposal, which accounts for the agreement in subject and language in the different poems.

But still the works of Madhavacharyya and Mukundaram are so full of similarities and analogous matter, that a passing review based on a comparative study of both may not be out of place here.

[1] Sahitya-Parishat Patrikā, p. 110, Srāvan, 1302 B.S.

[2] Madhavacharyya was born at the village of Nyānpur (now Gossainpur, Dist. Mymensingh, by the side of the river Meghna). Mukundaram was born at the village of Damunya (District Burdwan).

In the preliminary hymns of Madhavacharyya, we do not find any mention of Chaitanya. Kavikankan Mukundaram lays great stress on the great apostle. It is evident Chaitanya's influence had not yet spread so far as the locality of Madhavacharyya.

The story of the death of a demon named Mangal described in Madhavacharyya's poem is not found in the work of Mukundaram. Madhavacharyya tells us that the name Mangal-Chandi originated with the killing of a demon named Mangal by Chandi at the request of the gods, unlike the story of the Brahmavaivarta Purāna which gives a different version.

A noticeable digression of Mukundaram from Madhavacharyya lies in the delineation of the character of the money-lender of the Kalketu story. We do not find any character like that of Murāri Sil in Madhavacharyya's poem. He briefly describes the character of one Soma Datta, an honest fellow, in the place of Murāri Sil, the typical knave of Mukundaram.

But both the poets describe in vivid colours the typical rogue Bhāru Datta of the Kalketu story. Perhaps Bhāru Datta of Madhavacharyya surpassed in knavery his prototype as conceived by Mukunda. It may be said in this connection that Madhavacharyya's male characters were more manly than those of Munkundaram. Thus from a comparison of the description of the boyhood of Kalketu we find in Madhavacharyya's delineation a more robust and masculine character than in Mukundaram. It is peculiar that Dwija Hariram's and Kavikankan Mukundaram's descriptions were

very similar on the topic. The parallelism extends even into the very lines here and there of the pieces.

Kavikankan Mukundaram described all phases of Bengalee life in the 16th century. In the king Bikramkesari, Dhanapati, Lahana, Khullana and others we find the description of the uppermost grades in society while in Kālketu, Phullara and others we have an exact picture of the poverty-stricken people of Bengal. Middleclass men were not excluded by the poet including various castes and creeds and some typical examples are the vivid portraitures of Bhāru Datta and Murāri Sil. In Bulan Mandal we find a redoubtable leader of the ryots of Bengal who formed the backbone of the country, and in the maid-servant Durvalā, the familiar figure of a woman who pilfers her master's purse and causes dissensions in the family as a tale-bearer. The poet with his exact knowledge of the country has given us encyclopaedic information about the Bengal of his time. In this remarkable poem not only do we find a picture of society represented in all its grades, from the highest to the lowest, but also a good deal of information about the animal and vegetable worlds. We get a long list of forest-trees in his chapter on "cutting of trees," of flower-plants in Nilāmbara's "gathering of floral offerings for the worship of Siva," of various beasts of Bengal in "the lamentations of the beasts," and of birds in 'Khagāntaka and Mrigāntaka's entrance into the forest. Besides, a long account of culinary preparations together with a list of arms, musical instruments, ships and commercial products are also met with in various passages of the Chandikāvya of Kavikankan.

It has been pointed out by some scholars that Kavikankan's review of forest-animals gives a picture of the political atmosphere of Bengal in the 16th century. Indeed the similarity is so striking, and the poet attributes such a great human interest to the beasts, that one might suppose that the account is an administrative history of the country figuratively introduced under the guise of a religious legend.

The age of Kavikankan Mukundaram represents the period of transition in the progressive history of our literary language. This was the time when the attempts of the poets to Sanskritise Bengali had begun in right earnest. The Sanskritisation of Bengali in its fullest splendour is to be found in Bhāratchandra. Before him efforts were made in that direction by almost all poets from Krittivas down to Alaol. These attempts were marked sometimes by a considerable measure of success but often by a crudeness which raises a smile on our lips as grotesque. We have such lines, for instance, in Ramprasad as—

"জননী জাগৃহি জাগৃহি, এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি।"

In Kavikankan we find the vernacular element predominating in numerous passages reminding us of the language of the Ballads. Take for instance the "Vāramāsi" of Phullara—

"পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর তালপাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥"

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃঃ ৬৮ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

Another instance we take from the description of the interview of Kālketu with Murāri Sil—

"খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ,
আমি সে আল্যাঙ তার হেতু।
বণিক লুকায়ে ঘরে আসীয়া বাহ্মাণী তারে,
বলে ঘরে নাহি পোতদার।
সকালে তোমার খুড়া গেলা খাতকের পাড়া
কালী সে মাংশের পাবে ধার॥" ইত্যাদি।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃঃ ২১৭-২১৯
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)।

We add another instance from the account of the boyhood of Kālketu :—

"নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরিমাণ,
তুই বাহু লোহার শাবল।
শীল রূপ গুণে বাড়া জেন বাড়ে হাথি কড়া,
জিনে শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র ললাট তটী গলাতে জালের কাঠী,
করে জোড়া লোহার শিকালী।
উরে শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধুলী মাখে,
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী।"

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃঃ ১৩১-১৩৩
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)।

The language describing the animated debate of the merchants at the social gathering in the house of Dhanapati is unassuming in its rural simplicity and full of life and vigour. We have only referred to a few instances to show that Mukundaram, himself an accomplished scholar of Sanskrit, did

not discard the rural dialect of his country. In his hands this countrymade tool became an instrument of great force and literary power. But that he was pre-eminently a poet of the transition will be observed from the sprinkling of Sanskritic words with which he adorns his accounts. Even in the plain "Vāramāsi" of Phullara abounding with Prakritic expressions, of which a specimen has been given above, we come across lines like,—

"জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।"

The description of Dasabhujā who appeared before Kālketu is full of Sanskritic words, without a predominance of the vernacular element. Khullana tending sheep in the meadows of Ujāni laments her lot in Sanskritic style. The description of spring begins thus,—

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কানন।
কুসুম পরাগে মত্ত হৈল আলিগণ॥"

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃঃ ১৪৪ (বঙ্গবাসী সংস্করণ);

In fact, one would find the classical style and vernacular forms combined in the medley which Kavikankan has presented to us in his remarkable song. In his writings we do not certainly find the finished and harmonious concord in the commingling of Sanskrit and Bengali so strikingly observed in Bhāratchandra; still they unmistakably show that a new age of refinement was approaching, when Sanskritic expressions were to be largely imported, throwing into shade the rustic style and humour. Mukundaram is surely one of the typical

harbingers of this new school of Bengali poetry in the 16th century.

After Kavikankan Mukundaram's immortal work, the two poems on Mangal-Chandi that deserve notice belong to the 18th century. One of these poems was written by Bhabanisankar Das of Chittagong. He completed his work in 1779 A.D. The work will be equal in volume to Mukundaram's Chandikavya. The poem of Bhabanisankar is full of Sanskritic words as will be evidenced from his description of the goddess Chandi. The following lines may be cited by way of illustration :—

"পশ্য পশ্য পঙ্কজাঙ্ঘ্রি আনন্দে।
কনক মকর খাড়ু সহিতে বাজিছে ঘুঙ্ঘুরু,
নূপুর বাজ্যাছে পদারবিন্দে ॥"

(ভবানীশঙ্করের চণ্ডীকাব্য)।

The poet sometimes shows an intrinsic poetic merit and even rivals his great predecessor Mukundaram here and there. "Khullana's toilet" is an instance in this respect.

The work on Chandi by Jaynarayan, already referred to by as (No. XII in the list) is a poem of considerable merit. His Sanskritic style, of which a short specimen is quoted below, is a characteristic feature of his Poem.

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল।
দামামা ভ্রমর রব সঘনে বাজিল ॥
নব কিশলয়েতে পতাকা দশদিশেতে।
উড়িল কোকিল-সেনা সব চারি পাশেতে ॥
ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতিবেগেতে।
ফুলধনু পিঠে ফুলশর করপরেতে ॥"

(জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য)।

A VISIT TO BRINDABAN

Just on the eve of the Pujas last year I started for Brindaban with a party of nine students belonging to the Sixth Year Indian Vernaculars Department of the Calcutta University *via* Benares and Agra. The object of the tour was to combine the pleasures of an excursion with some enquiries in connection with the Vaisnava period of the Mediaeval Bengali literature and I spared no pains to utilise the brief period of twelve days at my disposal for that purpose.

We broke journey at Benares on our way to Brindaban and spent nearly two days hurriedly visiting some places of interest which we thought interesting enough to deserve attention. I may mention, in this connection, the temples of Viswanath and Annapurna, the Hindu University, Sarnath, the Observatory and the Twin Pillars. I was struck by the religious outlook of the Bengalee Hindus in contrast with that of the other peoples of India. Last time I happened to visit Puri-Bhubaneswar locality with a batch of students belonging to the Indian Vernaculars Department just as this year I visited Benares. Both the places contain relics of the Saiva cult and preserve associations of Buddhism and Jainism which to some extent subverted or influenced the Hindu cult of Siva. Siva at Bhubaneswar had to contend with the Jaina influence of Khandagiri-Udayagiri area while at Benares he had a similar rival in Buddha himself in the neighbouring village of Mrigadāva later on known as Sarnath. This place was chosen by

Buddha himself as his first preaching centre. In spite of his best efforts, perhaps, he did not achieve any appreciable success. The Bengalee Hindus patronise in a far greater degree the Siva of Benares than they do the Siva at Bhubaneswar. Its chief reason is not far to seek. Orissa has certain folk-lore similar to the folk-songs of Bengal in honour of Siva. Bengal and Orissa being for a pretty long time under one political domination developed many common points of culture and religion having drawn their inspiration from the Non-Aryan South. But when the outlook changed and the agricultural god Siva of Bengal became fully Aryanised, Bengal looked more to Benares than to Orissa for its religious inspiration. Hence, Benares became a great centre of pilgrimage for the Bengalee. This happened to such an extent that the Bengalees gradually began to settle at Benares in large numbers and in course of time made the town an adjunct of Bengal Under the circumstances, the Sivayana literature of Bengal has very little to do with the traditions of the god of Benares, though the Annadāmangal of Bhārat Chandra has many references to the god and the place. As regards Sarnath the stupendous stupa and the excavations around, inflamed the imagination of the students and made them think of the past greatness of India. The same, however, cannot be said of the recent architecture and paintings of Mulagandhakuti-vihara (a neighbouring building) belonging to a certain Ceylonese organisation. The fresco-paintings here were executed by the celebrated Japanese artist, Mr. Noshu. These seemed excellent indeed, but whether the combination of the ideal of Ajanta School of painting with

that of the Japanese School is at all happy—is for connoisseurs to decide.

Leaving Benares we reached Agra on the 15th October. There we passed two days in sight-seeing. The fine Moghul architecture and sculpture as represented in the Tajmahal, Agra Fort, Sikandra, Itimad ud-daullah and Fatehpur-Sikri overwhelmed us. We also admired the workmanship in some other minor buildings of the place. There may not be any connection of these buildings directly with our literature still their cultural value is immense. The beautiful queen of the Mausoleums, the Taj, created an impression in our minds never to be forgotten. The Sikandra, a few miles off from the town, contains the grave of the celebrated Akbar, while the building of Itimad-ud-daullah, as its name indicates, contains the grave of Itimad-ud-daullah (Nurjahan's father) and of his family. All these fine buildings are splendid monuments of Moghul architecture. At Sikri the Moghul art is relieved here and there with specimens of Hindu and Chinese arts. Besides, the stupendous gate of Sikri known as the Buland-Durwaza with huge flights of stairs, cannot escape one's notice. The grand buildings at Agra overlooking the Taj contain many reminiscences of Sahajahan and Aurangzeb. The buildings as described in our old Bengali literature bear some resemblance to the specimens of architecture in the Up-country so far as hugeness and general plans are concerned. Here we miss, however, our Bāraduāri Ghar, Bāṅgālā Ghar and the huge tanks, but nevertheless there are the Jaltungi pillars, courtyards and compounds as described in our Bengali literature. Our literature describes a

combination of Hindu and Indo-Saracenic art in the construction of towns and buildings, as a natural sequel to the composition of many literary works during Islamic rule in Bengal.

We left Agra on Saturday, the 17th and reached Brindaban the same evening. The whole journey from Howrah to Brindaban in spite of occasional stoppages was extremley tiresome. However, we reached our destination safely. Our stay in the place was for nearly six days, and we finished our work as much as possible with haste within this short time. On reaching the destination our dream was somewhat shaken regarding the idyllic land of Lord Krishna. The present Brindaban is a small town with narrow streets and lanes and closely packed buildings. The town once stood on the very bank of the tortoise-infested Jamuna but now the river has receded considerably from the town leaving only a sandy waste in the intervening space.

Brindaban possesses some fine temples, relics and associations (some genuine and some spurious) in connection with the Vaisnava cult which deserves close attention, specially as we are interested in Bengali literature which contains many references to Vaisnavism.

Regarding the topography of the place we should make it clear that the present town of Brindaban is situated in the region called Brajamandal which is about 84 crores in circumference. The locality was under the Kings of Mathuramandal, Madhuban or Surasena country as it remains today under the District Officer of the District of Mathura. Madhuban became famous in the Rāmāyana story as the place of Laban Daitya, evidently

a non-Aryan chief, who was defeated and killed by Rama's youngest brother, Satrughna, whose family henceforth ruled the land for a long time. Most of the buildings of the present town of Brindaban are hardly two hundred and fifty years old and its former name was Fakirabad. Yet the traditions of the place are much older than its present buildings and the town began to grow from the days of Sanatana Goswami who belonged to the middle of the 16th century. Both the towns of Mathura and Brindaban stand on the same bank of the Jamuna and there is nothing to prove that they once occupied opposite banks as some scholars would have us believe. The town of Brindaban is only six miles to the west of the town of Mathura. On the opposite bank of Mathura some four miles to the east lies the locality of Gokula. According to a local tradition there were two chiefs who lived side by side in Gokula. One of them was Nanda Ghosh (foster-father of Sree Krishna) and the other was Brikabhanu (father of Sree Radha). Nanda Ghosh's place was known as Mahaban while Brikabhanu's place was known as Raul where Radha was born. Nanda, after keeping baby Sree Krishna in his custody when stolen from the palace of Kaṁsa, king of Mathura, found it unsafe to remain within so short a distance from Mathura only the river Jamuna intervening. So, he shifted from Gokula and established himself at a place called after him Nandagram which was about 22 miles from Mathura. Brikabhanu also changed his place and settled within three miles from Nanda's new town. Brikabhanu's new place was known as Barshān. Both Nandagram and Barshān are within Brajamandal

and are situated along with Mathura on the right bank of the Jamuna and therefore on the same side. The "Dan-ghat" (*lit.* Toll-collecting Ghat) associated with Krishna's sports with Radha on a boat, is about 19 miles to the west of the town of Brindaban whilst Mathura stands to its east and in this locality is situated the traditional hillock Gobardhan. Both the "Dan-ghat" on the Jamuna and the Gobardhan are over twenty-two miles from Mathura town. The whole region of Brajamandal, as we were told, is full of pasture lands, and some parts of it, as seen by us, corroborate this fact.

It is very difficult to reconcile the different theories regarding the topography of Brajamandal and Mathuramandal. Some scholars would say that the river originally flowed between the towns of Brindaban and Mathura and now both occupy the same bank owing to the Jamuna changing its course. Unfortunately, there is nothing to substantiate or corroborate it although there are some signs of erosion and slight changes in the course of the river. Some would resent even the very name of Radha as fictitious and of later introduction while our whole Vaisnava lyrical literature depends on her existence not only spiritually but also physically to illusrtate " parakiyā " amours of Radha-Krishna. Even admitting that there was a Radha, the Bengalee Vaisnavas of Brindaban will never agree to her carrying milk-pail to Mathura as she was a princess and her father was supposed to have been more powerful than Nanda. If at all she carried the milk-pail and met Sree Krishna on the "Dan-ghat," it was at a place far removed from Mathura which stands on the same side with Barshān and Dan-

ghat. If we believe in the topography, then selling of milk by the Gopis of Brindaban in the market of the Mathura town cannot stand as a credible suggestion. Then also falls through the consequent amours of Radha-Krishna on the Jamuna. To meet the situation, the Bengalee Vaisnavas of Brindaban would invent a myth,—that it was done supernaturally, and thereby the distance was covered. A parallelism is drawn with the opening and closing of petals of a lotus. The closing of petals means shortening the distance and opening up means its lengthening. All, of course, was possible due to the divine and sportive nature of Sree Krishna. What comment should we make on this?

The whole topography of the place as it now stands does not support the amours of Radha and Krishna on the Jamuna unless we place the whole scene in Gokula which, as I have already said, lies to the east of Mathura on the other bank of the Jamuna about four miles off. According to the legend Nanda deserted Mahaban in Gokula and went to live in Nandagram in Brajamandal followed by Brikabhānu when Krishna was only a baby. For a mere baby to have taken part in the sports described by Bengalee Vaishnava poets is a manifest impossibility. Besides, we know Akrura, the messenger of king Kaṁsa, invited and took with him Krishna and Balaram from Nandagram and not from Mahaban to Mathura to attend the 'Dhanuryajna' of Kaṁsa who was ultimately killed by Sree Krishna. At the time Akrura visited Nandagram in Brajamandal, Krishna was making love to Radha and other Gopis and performing various feats to astonish his brother cowboys. So, the whole scene

of the Krishna legend in connection with his love-making to Radha requires to be placed in Braja-mandal and not in Gokula, considering the location of the place, unless we take the help of divine dispensation. To account for things, is it reasonable to dismiss all the local identification of places and find out new ones to support the scenes of the Radha-Krishna legend?

The basis of our own lyrical literature wholly depends on the reality of the amorous sports (*Lila*) of Radha and Krishna by the side of and on the bosom of the river Jamuna. What will be the condition of Dānkhanda and Naukākhanda of Sree-Krishna-Kirtan attributed to one Chandidas and the lyrics of other poets, if we do not admit their connection with these amours?

The town of Brindaban, as it stands to-day, owes its origin to the efforts of Sanatana and other Bengalee Vaisnava saints known as the Vaisnava Goswamis. How Sanatana built his first temple of Madanmohan with the help of a merchant is a story even now on everybody's lips at Brindaban. After this temple many others followed, the chief of which are those of Govindaji and Gopinath. Besides these, there are hundreds of other temples. Among them the temple of Sahaji, the temple of Sethji, the temples of Bankubehari, Radha-Damodar, Syam-sundar, Radhaballav, Radharaman and Gokula-nanda, Holdar's temple, Tarash temple, Lala Babu's temple, besides Tarakumar's Asram, Adwaita-bat, Sringar-bat, Tentul-talā, Jamunā Pulin, Kāliya Daman, Brahma Kunda, Nidhuban and Nikuñja-ban, deserve special notice. Of the above, Madan-mohan, as we have said, was installed by Sanatana

Goswami. In this temple many relics of Chaitanya Dev and his followers are found. Unfortunately, the original images of Madanmohan and Radharani are not to be found as they were long ago taken away by the Raja of Karauli. The temple of Gopinath attributed to Madhu Pandit and associated with the family of Nityananda is an important one. The temple of Govindaji, though built by the Raja of Jaipur has Bengalee association. It is a remarkably fine specimen of Hindu temple architecture. The temple of Radharaman has associations with Gopal Bhatta Goswami. The temple of Gokulananda possesses the memory of Lokenath, "Sringar-bat" has associations with Nityananda, "Adwaita-bat" of Adwaita and "Tentul-tala" (Tamarind-tree shade) of Chaitanya Dev. Under the shade of this latter tree Chaitanya Dev used to sit during his brief visit to Brindaban, meditating about Lord Krishna and the place was once situated overlooking the Jamuna. The temple of Radha-Damodar bears reminiscences of Jiva Goswami; the Bankubehari temple of the Nimbarka sect and the Radhaballav temple of the Ballavi sect also deserve mention. The images in the temple built by the Tarash Zemindar family are remarkable for their beauty. It may be mentioned here that almost all the images in various temples are remarkably handsome. The two temples of Sahaji and Sethji and specially that of Sethji may be said to be the grandest in Brindaban. This temple of Sethji is a very fine specimen of Hindu temple-building. Its type is South-Indian and the South-Indian priests prevail there. The temple is attributed to Jagat Seth. Though he was not a South-Indian himself it bears the stamp of that side

as his Guru came from that part of India. This temple was built at an enormous cost and maintains a batch of 108 priests. The expenses of the temple are Rs. 365 per diem. We had the fortune to visit the temple during its annual celebration. The whole scene of the Puja and the procession was indeed majestic, creating an atmosphere of the old days of Hindu glory. The Gaṛur Stambha or pillar in the front courtyard is coated wholly with gold and the people call it erroneously "Sonār Tāl-gāchh" (golden palm tree). Its height is about twenty-two feet from the base and looks very impressive. Episodes from Hindu mythology have been engraved on the stone walls all around and the images are marvellously executed. The presiding deity of the temple is, of course, Krishna named Ranganath. The temple of Sahaji has one very special peculiarity. The marble pillars supporting the roof are zigzag in appearance. Nowhere have we seen pillars of this type. These impressed us by the massiveness of their costly stones as well as by the expenses and workmanship entailed in their execution.

A few remarks may now be made as regards the Vaisnava theology and the position of the Bengalee Vaisnavas in Brindaban. The Bengalee Vaisnavas belong to that group of the Vaisnavas known as the Gauṛiya Vaisnavas. The originator of this group was Chaitanya Dev himself. As is well known, at first the god Vishnu was worshipped by the Vaisnavas as the very name of the sect indicates. Then the idea of "Avatār" or incarnation came to the forefront and so we get first Rama as a part incarnation and then Krishna as full incarnation of Vishnu, among many of his incarnations, to save the

world from the hands of the non-believing sinners. Last of all came Chaitanya Dev whom his followers believe to have been an incarnation of Sree Krishna (not of Vishnu). Apart from the worshippers of Vishnu and Rama those of Sree Krishna and Chaitanya Dev require our close investigation. Among the various qualities of God, the two which have attracted the greatest attention of the devotees are the " Aiswaryya Guṇa " and " Mādhuryya Rasa ". We (the Bengalees) have been captivated with the latter quality of God, as the non-Bengalees with the former. Thus, we find in the Up-country the Rama-cult has more votaries than that of Krishna-cult. " Aiswaryya " connotes power and fortune while " Mādhuryya " means love. Krishna, of course, possesses both these two qualities in him. The non-Bengalees seem to have more liking for the ' Aiswaryya ' quality of Krishna and so they revel in his exploits in Mathura, Dwaraka and in the internecine struggle of the Kauravas and the Pandavas. The Bengalees, on the other hand, are zealous supporters of the " Mādhuryya Rasa " and they have shown their leanings to it so much so that they did not allow any temple of Lakshmi (Goddess of Fortune) to stand at Brindaban when they found the town. As a result a temple of Lakshmi exists only 3 miles off from Brindaban on the other side of the Jamuna, the place being known as Belban where people flock to worship her on certain days per month as they do not like to miss her favour in worldy affairs. Even when we consider this Mādhuryya quality we find that there are two views in its connection. Some uphold " Swakiyā " view and some " Parakiyā " and " Madhura Rasa " being

the greatest quality of God, according to some Vaisnavas, it cannot be cultivated adequately by a man with his own wife (" Swakiyā "). This love-making should be done with " Parakiyā " which involves great risk and sacrifice. Chaitanya Dev held the Parakiyā view. The Maddhi sect to which he belonged was originally a South-Indian sect. His connection with this sect as well as his liking for Ramananda of the Deccan with whom he had a famous conversation about the " Madhura Rasa " seem to have some influence over Chaitanya Dev in establishing the " Parakiyā " theory among his followers. Henceforth his followers of Bengal were known as the Gauṛiya Vaisnavas.

The chief temple of the Bengalee Vaisnavas at Brindaban, as referred to before, is that of Madanmohan. The Bengalees seem to have forgotten Madhabendra Puri who first found the image of Gopal at Brindaban locality and to whose sect (Maddhi) Chaitanya Dev himself belonged. They only remember Chaitanya and his followers. In every Bengalee temple the deified image of Chaitanya is to be found while in most cases we shall miss the same in non-Bengalee temples. Now, as everybody knows, among the three centres of the Bengalee Vaisnavas—Navadwip, Puri and Brindaban—Navadwip is most associated with the name of Chaitanya Dev though Puri saw him as a living God during the latter part of his life, while Brindaban was only casually visited by him. So, however much importance Chaitanya Dev himself attributed to Brindaban, his followers were satisfied with his personality and did not think much of that place. The importance which the Gauṛiya Vais-

navas attach to the place is more in connection with Chaitanya Dev and his followers, especially the Goswamis, than with the Radha-Krishna legend.

To the idealists of "Parakiyā" the introduction of Radha was essential. She was not the wife of Krishna in her earthly relationship and the love-adventures of the two, *viz.*, Radha and Krishna, are illustrative of the "Parakiyā" theory of the Bengalee Vaisnavas. There is one subordinate element (a kind of subcurrent) furnished in the episode of love-making by Chandrāvali, the chief rival of Radha in connection with Krishna. Krishna would some time visit Radha, some time Chandrāvali, though Radha had his chief attention. Legends say many things about the two, even of their previous amours in heaven. It is peculiar, in the Bengali poetical work Sree Krishna-Kirtan, this Chandrāvali has been identified with Radha while no other Bengali work and Bengalee convention support this view. At Brindaban no trace of Chandrāvali has been found, but we find Radha in every temple. "Radharani" is the term which is on the lips of everybody at Brindaban.

To the Vaisnavas of other provinces the injunction of the six Goswamis have little value. Even a sect of the modern Vaisnavas of Bengal have disclaimed the infallibility of the Goswamis. They are the present "Gauṛiya Math" people of Bengal. They are now trying to have a stable footing at Brindaban, inspite of the somewhat unfriendly attitude of the Gauṛiya Vaisnavas. The extreme wing of the Parakiyā preachers are the Sahajiyās. I scented a considerable number of them at this

place, but have not been able to know much of them for obvious difficulties.

Regarded as a centre of Vaisnava culture and learning the place is not very progressive. However, the Bhakti-Vidyalaya, founded under the auspices of the Gauṛiya Vaisnavas, is doing some good work for the Vaisnava public. But its shortness of funds and lack of public sympathy made us entertain misgivings regarding its future. The school is run mainly through the energetic efforts of Sreejut Kaminikumar Ghosh and his worthy son Dr. Gaurapada Ghosh (both residents of Brindaban) who deserve our unstinted praise. We visited this school and found to our satisfaction that the authorities have opened already two departments, one for Vyakaran (Grammar) and another for Darsan (Philosophy). Of course both are taught on Vaisnava lines. The Harināmāmrita Vyakaran and Hari-Bhakti-Bilās are the two important books read by pupils of this school. We attended one good Kirtan party organised at the house of Sreejuts Nitai Das and Brindaban Das. Sreejut Nitai Das is ably editing the Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj which he showed to us. We could not visit very many parties of Kirtan at the place and so are hardly competent to give any considered opinion about them.

In every speaker at Brindaban we found great enthusiasm in explaining the sectarian dogmas to strangers, often embellished by supernatural elements. In these stories wonderful dreams figured most and even trees talked. Be that as it may, my tour with the students to Brindaban was fruit-

ful in many ways. Before coming to this place our ideas about its topography in its bearing on the legend of Krishna were rather hazy. Besides, the references in our own literature made us compare them by a visit to the place for clearing certain problems from our first-hand knowledge. In more sense than one our visit to the place was a success and for this we are grateful to our present Vice-Chancellor. Yet we had our disappointments too. People who come to Brindaban to see holy places visit the whole of Brajamandal. In the open fields they have to live in tents and shift from place to place. But it requires time and money, of both of which we had very little. Under the circumstances we had perforce to remain satisfied by visiting the main temples of the town of Brindaban and leaving the Arcadian country of Braja associated with the hallowed name of Radha-Krishna for a future batch to visit.

We went to Mathura on Wednesday, the 21st October, only for a day. What we saw there did not impress us much. We could visit only a few important temples and *ghats*. The *ghats* are Mathura's speciality. Unlike Brindaban the town of Mathura faces the river Jamuna and the whole length of it is studded with fine *ghats*. Here also the Jamuna is full of islets and the railway bridge is doing much harm to it. Among the temples visited by us were those of Dwarkanath, Kubjanath, Kaṁsamardan, Kālbhairab, Dhruba, Bali and Saptarsi and among the *ghats*, those of Bisram Ghat and Dhruba Ghat. At Bisram Ghat we witnessed that very interesting ceremony, the " ārati " of the Jamuna. For want of time some of

us could not visit Bhuteswar Mahadev* and Radha Kund (22 miles from Mathura). Near the latter, Krishnadas Kaviraj wrote his immortal book Chaitanya Charitamrita. The Dan-ghat is also situated as we have said before, in this locality. The chief temple with some air of grandeur is that of Dwarakanath. The other temples are but poor specimens of Hindu architecture. We regret we could not study carefully the specimens at the Mathura Municipal Museum. The Gauṛiya theology has failed to strike any deep root at Mathura. The Gauṛiya Vaisnavas have very little hold on the people of the town, and as a matter of fact, the Bengalee population at Mathura is very small. Chaitanya Dev and his followers seem to have made no impression at this place. Even the cult of Krishna has very little "Madhura Rasa" in it, as Krishna in "Aiswaryya" is being shown all over the town. Thus, in place of Radha—Kubja and Rukmini figure prominently, and in two places, *viz.*, Kubjanath and Dhruba-tilā, Vishnu figures with four arms adorned with Sankha, Chakra, Gadā and Padma and not Krishna with his flute. From what I have seen in Brindaban-Mathura locality, I surmise that after the demise of Chaitanya Dev at Puri, the Goswamis found it hard to hold ground in favour of their own peculiar theology and so being disappointed sent back their

* Perhaps very few people are now aware that Brindaban was once an important holy place of the Sakti cult. According to tradition, of the 51 parts of the body of dead Sati (Durga), consort of Siva, one part fell here. It was her hair.

The name of the Sakti goddess here is Uma and her Bhairab (Siva) is known as Bhutesh. This shows that the Sākta cult prevailed here before the introduction of Vaisnavism.

valuable literary productions to Bengal—their own land—for better preservation. They were not far wrong in their apprehensions, as we can guess from the present condition of Brindaban in this respect.

We would have been glad to secure some old Vaisnava manuscripts but unfortunately could secure none. We heard valuable Vaisnava manuscripts may be found in the temple of Radha-Damodar (place of Jiva Goswami) which is now in the hands of a Receiver. So they are difficult to procure, but we hope our University will try some day to posses them for the benefit of Vaisnava scholars of Bengal.

In this connection I would like to point out that doubts may lurk in the minds of some, regarding the utility of sending students of this Department outside Bengal and not confine their educational activities within the bounds of this province. The condition of Bengali language and literature does not warrant such doubts. Such excursions outside Bengal, besides broadening the outlook, help in the proper understanding of many references and allusions that our literature contains. Of course, attention should more be confined to to places and regions within Bengal for this purpose.

RAJA GANESH

In the list of patrons who befriended our Bengali literature at different periods of its history the name of Raja Ganesh somehow found a place. It has been stated that it was at his court, our first great poet Krittivās appeared and received the royal command to compose his epoch-making poem. The name of Raja Ganesh on account of his association with the popular poet of Bengal is of special interest to scholars, who have been trying to solve the mystery encircling his life.

In this connection the first point that comes across the mind for consideration is whether Raja Ganesh and Danujmardan were one and the same person or two entirely different persons. There is a considerable difference[1] of opinion, however, amongst scholars on this matter.

Our first attempt would naturally be to sift the evidence of the old Bengali literature with a view to throw all available light on this point.

(*a*) In the autobiography of Krittivās the following two lines occur :—

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র ছিল নরসিংহ ওঝা॥"

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসের আত্মচরিত।

---

[1] Among those who consider Raja Ganesh and Danujmardan as one and the same person we may mention H.E. Stapleton, Nalini K. Bhattasali, Nagendra Nath Vasu and Dinesh Chandra Sen. Among those who believe in separate identity the most prominent are Rakhaldas Banerjee and Nikhilnath Ray.

(Once there was a king named Bedānuja. His minister was Narasingha Ojhā.—

(The autobiography of Krittivās in his Rāmāyaṇa.)

Dr. D. C. Sen and others of his line of thought consider that 'Bedānuja' is a mis-reading, the letter "যে" has been read as "বে" They hold that it should be "Ye Danuja" ("যে দনুজ"). The name of Danujmardan has been according to this view mentioned in the famous Rāmāyaṇa of Krittivāsa.

(*b*) In the celebrated Vaisnava work Bhaktiratnākar (written in Bengali) we find a Sanskrit quotation from the Laghutosini of Jiva Goswami, which contains the name of Danujmardan Deva :—

"ততোদনুজমর্দ্দন ক্ষিতিপ পূজ্যপাদঃ।
ক্রমাদুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভকৃতি ॥"

—ভক্তিরত্নাকর।

(That person of consequence, Padmanābha, gradually settled at Nabahatta and became honoured by the king Danujmardan.—

Bhaktiratnākar.)

N.B.—Nabahatta seems to be the famous village Naihati near Katowa and not the place Naihati (E. B. Ry.) near Calcutta. Padmanābha was the forefather of Jiva Goswāmi. There is scarcely any other reference to Danujmardan in old Bengali literature (so far as our information goes), but the coins, on the contrary, of Danuj are found, while there is no numismatic evidence directly about Ganesh anywhere up till now. This fact is significant, no doubt.

Now, so far as the name of Ganesh is concerned the following references are important:—

(*a*) "প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্বকাল॥"
—প্রেমবিলাস (নিত্যানন্দদাস বিরচিত),
চতুর্ব্বিংশ বিলাস, পৃঃ ২৮৪।

(Narasingha Nāṛiāl, son of Prabhākar, was always known as the minister of Raja Ganesh.—
Prembilās by Nityānanda Das,[1]
24th Vilas, p. 284.)

N. B.—Nagendrana Vasu's version of the Sadānanda-Kārikā contains the name of one Prabhākar who was the great-grandfather of Raja Ganesh.

(*b*) "দৈবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা॥"
—প্রেমবিলাস, চতুর্ব্বিংশ বিলাস, পৃঃ ২৮৪।

(Fate brought Narasingha Nāṛiāl from Sylhet to the presence of Raja Ganesh who honoured him.—
Prembilās by Nityānanda Das,
24th Vilas, p. 284.)

N.B.—According to Adwaita-Prakās 1329 Saka or 1407 A.D. was the date of the conquest of Gauṛ by Ganesh.

(*c*) "যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥

[1] The genuineness of the four Vilāsas after the 20th is rightly doubted by many, and as such, the references about the various Brāhmān sub-castes found in the 24th Vilāsa may be considered as spurious. Still, I made use of the above two references for our present purpose.

যেই নরসিংহযশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদসাহ মারি গৌড়ের হৈল রাজা॥
যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি॥"
—অদ্বৈত-প্রকাশ (ঈশান নাগর কৃত)।

(He, who was known as Narasingha Nāṛiāl and belonged to 'Siddha-Srotriya' Brahman family of Aru Ojha—he, whose fame spreads through the three worlds and who was versed in all the Sāstras and very intelligent—he, whose advise made it possible for Ganesh to become the Raja at Gauṛ by killing the Bādsāha of Gauṛ and the marriage of whose daughter occasioned the family of Kāps—he, whose home was the locality of Lāuṛ, etc., etc.
Adwaita-Prakās by Ishān Nāgar.)

(*d*) Besides the above, the Sanskrit work known as "Bālya-Lilā Sutra" (by Lāuṛiā Krishnadās) which deals with the early life of Adwaitāchāryya mentions incidentally of Raja Ganesh as follows:—

"শ্রীমান নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ
যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞ।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী॥
সদ্বংশশৈলে[1] দ্বিজরাজকল্পো
বেদজ্ঞ সদ্বিপ্রসমাশ্রয়োয়ঃ।

1 This 'সদ্বংশশৈলে' becomes 'কায়স্থশৈলে' in 'বগুড়ার ইতিহাস written by Pravas Chandra Dev Barman, a Kayastha.

তুষ্টস্ত শাস্তা কিল সাধুপালো
দাতা গুণজ্ঞ হরিভক্তচূড়ঃ ॥[1]
দূতৈস্তমানীয় চ রাজধান্যাং
দিনাজপুরাখ্যে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে
সংন্যস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥
তদ্ব্যক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা
শ্রীমদ্গনেশো বরদস্যারূপান্।
গৌড়স্থপালান্ যবনাত্মজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্রধৃগভূৎ ॥"
—শ্রীবাল্যলীলাসূত্র (লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস কৃত),
১ম সর্গ, শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্পাদিত, ১১ পৃষ্ঠা।

The meaning of the whole piece is—Raja Ganesh, who was well-versed in all the Sāstras, was charmed with the fame of the great Nrisingha. Therefore, the king,—who belonged to good lineage and was its chief representative (*lit.* like the moon shining over the cliff of lineage), who was well-versed in the lore of the Vedas, who was the supporter of all good Brahmans, who was the punisher of all evil-doers, who was the maintainer of all good

[1] It is peculiar that while at this place we find the epithet of Ganesh as 'হরিভক্তচূড়ঃ,' *i.e.*, a very staunch devotee of the God Hari (and therefore he was a Vaisnava) we again find about Danujmardan the epithet of 'চণ্ডীচরণপরায়ণঃ,' *i.e.*, "a worshipper of the Goddess Chandi". This may be accounted for by the fact that Bengal in those days of great religious toleration, had worshippers who paid their tribute of devotion to all the gods and goddesses of the Hindu pantheon.

men, who was charitably disposed, who was the appreciator of all deserving men, who was the most devout (*lit.* pinnacle) among all the devotees of God Hari—brought Nrisingha to his capital at Dinajpur which was full of courtiers. That good Nrisingha, who was an adept in politics, was given the post of a minister by the king. It was the crafty policy of Nrisingha which made it possible for Ganesh to secure victory over the freebooting Mahomedans who were rulers of Gauṛ, and attain the position of the Lord of Gauṛ. It was in 1329 Saka (1407 A.D.) that clever Ganesh defeated the Mahomedan ruler and became the undisputed ruler over Gauṛ.

Srī Bālyalilā-Sūtra by Lāuṛiā Krishnadās, 1st Canto, 11th page, edited by Achyutacharan Chaudhuri.

The above quotations provide us with the names of Danujmardan and Ganesh. If it may be shown that they were contemporary then, of course, this evidence will go a great way in proving their identity as one person. Besides, if it may be proved that a certain individual was courtier in the courts of both of them, then, surely Danuj and Ganesh will be taken as one and the same person. Circumstantial evidence may also help us in this direction.

N.B.—Rakhaldas Banerjee believed in separate identity[1] and maintained that Danuj was a feudatory chief in 1417 A.D. during the time of

[1] According to Nalinikanta Bhattasali, Rakhaldas latterly changed his opinion and was in favour of identifying Danuj with Ganesh. See পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ B.S., in which he refutes the argument of Nikhil N. Ray whose article appeared in পঞ্চপুষ্প. ফাল্গুন, ১৩৩৭ B.S.

Jadu and earned the epithet of Danujmardan due to his hostility to the Mahomedans. Both R. D. Banerjee and his opponents agreed so far as numismatic evidences about the dates go, but arrived at quite different conclusions as regards the identity of Ganesh with Danujmardan. The critics with the rival theory believed that Ganesh himself adopted the name of Danujmardan after destroying the Mahomedan rule of Gauṛ. The word "Danuj" may here be taken to mean the Mahomedans and the term "Mardan" means "destroyer". So the word quite fits the theory of Ganesh being taken as Danujmardan. Although Ferishta was of opinion that Ganesh favoured the Mahomedans, Riaz held a quite different view. Yet, it may be surmised that his very fight with the Mahomedans for the throne of Gauṛ might have prompted him to issue coins in that name (Danujmardan). The dates of the coins issued by Danujmardan and those by Jadu are the sources of great puzzle. Some coins of both are almost contemporary while no coin in the name of Ganesh has yet been found. The temporary occupation of the throne by Jadu during the life-time of his father Ganesh, if it ever happened, may partly explain the problem. The real difficulty with Ganesh and Danujmardan is that coins of the latter are profusely found in the remote districts of Chittagong, Maldah and Subarnagram, and even the coins of Jadu are found in numbers, but not a single coin in the name of Ganesh has yet been discovered.

Before drawing any conclusion, let us first mention here the genealogies of some persons who were connected with either Danuj or Ganesh.

1
Narasingha Ojhā (settled at Fulia and became a minister of Raja Danujmardan)
Garveswar
Murāri
Suryya
Govinda
Banamāli (married Mālini)
Krittivās (born between 1432 to 1444 A.D.,—opinion of Mr. Jogeshchandra Ray).
2
Narasingha Nāriāl (a minister to Raja Ganesh).
Chhakari
Kuver Pandit
Kamalākānta (Kamalākara Chakravarti or Adwaitāchāryya or Sadāsiva—He was originally an inhabitant of Lāuṛ in Sylhet and was born in 1434 A.D. or 52 years before Chaitanya Dev).
3
Jagat Guru (a king of Karnāṭa in the Deccan, reigned till 1414 A.D.)
Aniruddha (died in 1416 A.D.).
Rupeswara
(He came to Bengal and became a minister. He died in 1433 A.D.)
Harihara
Padmanābha (He was honoured by Raja Danujmardan and built a house at Navahatta or Naihati near Katowa).
Purusottama
Jagannātha
Nārāyaṇa
Murari
Mukunda
Kumāra Deva (settled temporarily at Backerganj.)
Sanātana
Rupa
Ballava
(alias Aṇupama. Jiva Goswami, his son, born in 1513 A.D.)

(4) Remarks about the genealogies :—

From the above genealogical tables as well as quotations it may be seen that Raja Ganesh had one minister named Narasingha Nāriāl whose politic advice was responsible for the upset of the Islamic rule in Bengal for a brief period. Again, it may also be seen that Raja Danujmardan had two ministers, *e.g.*, Padmanābha and Narasingha Ojhā. The home of Narasingha Nāriāl was at Santipur while that of Narasingha Ojhā was at Fulia—an adjacent village. Besides, the home of Padmanābha was at Nabahatta or Naihati, not very far from Katowa in the District of Burdwan. The genealogical tables will clearly show that Narasingha Ojhā and Narasingha Nāriāl as well as Padmanābha were contemporary. Inspite of some discrepancy of the dates of Danuj, Ganesh and Jadu and conflicting opinions, chiefly on the basis of stray numismatic evidence, we are inclined to say that on the basis of literary evidence Narasingha Nāriāl and Narasingha Ojhā were surely contemporary, and as such, Danuj and Ganesh were also contemporary. Now, if we accept the proposition that Ganesh occupied the throne of Gauṛ and became a powerful king then how another prince named Danuj could rule with power, side by side, in the same period with minister and court not very far from Gauṛ (rather to the opposite bank of the Ganges) and yet not mentioned profusely in Bengali literature, while Ganesh is repeatedly mentioned with respect in this literature? If Ganesh and Danuj were two monarchs then such a state of things would no doubt be absurd. Under the circumstances we have got no option, so far as the

evidence of the Bengali literature goes, but to accept Ganesh and Danuj as one and the same person and that is the reason why coins in the name of Ganesh is not found. It seems that Danujmardan was the title of Ganesh after his occupation of the throne of Gauṛ by killing the Mahomedan sovereign. Now, some people think that Narasingha Ojhā and Narasingha Nāriāl were one and the same person. It is surely not so. Narasingha Nāriāl was a Barendra Brahman of Srotriya (Non-Kulin) family while Narasingha Ojhā was a Rāṛhi Brahman of Fulia, the village giving rise to the name of a special class (gāin) of Rāṛhi Mukherjee Kulin Brahmans. Besides, the home of the former was originally at Nāruli in Sylhet (in the easternmost corner of East Bengal) and later on at Santipur (in Navadwip District of West Bengal) while the latter (*e.g.*, Narasingha Ojhā) hailed from Fateabad Parganah (in the District of Backerganj) and later on settled at Fulia (in Navadwip District) by the side of the Ganges and near Santipur. The forefathers of Padmanābha also hailed from different places and he settled finally at Naihati near Katowa (Burdwan District) coming from Backerganj side. Under the circumstances Narasingha Ojhā and Narasingha Nāriāl must be taken as different persons and on the basis of literary and genealogical evidences, all three, *e.g.*, Narasingha Nāriāl, Narasingha Ojhā and Padmanābha (the forefather of Jiva Goswami who belonged to the Karṇāṭa Brahman family) were separate but nevertheless contemporary persons.

Further, Danuj had ministers (*e.g.*, Padmanābha and Narasingha Ojhā) one of which (*e.g.*,

Narasingha Ojhā) lived in the neighbourhood of the residence of Narasingha Nāriāl who was the minister of Ganesh. If Danuj and Ganesh were separate persons then, of course, the two ministers of two powerful and contemporary sovereigns were living side by side. This idea of different personalities of Danuj and Ganesh, is far from tenable from circumstantial evidence. Ganesh was a pillar of the Barendra Brahman society and as such performed yeoman's service to his community with the help of his able minister Narasingha Nāriāl while Danuj with the help of his Rāṛhi Brahman minister (*e.g.*, Narasingha Ojhā) could also do the same and surely the literature on social subjects would not pass this unnoticed. But there are no such records to prove this. So from various viewpoints we have no alternative but to accept the proposition that Danuj and Ganesh were one and the same person with at least three principal ministers, *e.g.*, Narasingha Nāriāl, Narasingha Ojhā and Padmanābha.

From the genealogical and other records it is evident that Krittivās could not be present in the court of Raja Ganesh or Danuj mentioned above. Krittivās possibly attended the court of Raja Kaṁsanārāyaṇ of Tahirpur (Rajshahi District).[1]

[1] By the by, our mind should be disabused of the theory that Krittivās, a descendant of Narasingha Ojhā, attended the court of Raja Ganesh.

The genealogical records point to Kaṁsanārāyaṇ and further mentions the names of Jagadānanda and Kedar Ray (or Khan). Thus, there is no doubt that Krittivās visited the court of the powerful chief Kaṁsanārāyaṇ whose title of "Gauṛeśwara" as given by his panegyrist Krittivās was once very common for any powerful chief to secure. It is this title of "Gauṛeśwara" which is mainly responsible for the wrong surmise that Raja Ganesh was the patron

About the courtiers of Gauṛeswar as mentioned by Krittivās it may be said from the authority of "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" that শ্রীবৎস or really শ্রীকৃষ্ণ was sister's husband to Raja Kaṁsanārāyan. Sri-Krishna's sons were Subuddhi Ray, Kesab Khan, and Jagadānanda Ray which may be shown from the genealogical table below:—
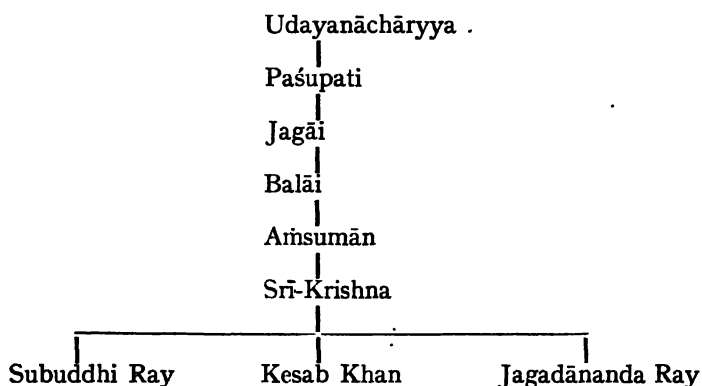
As for the name " Datta Khan " the credit of its discovery and identification with the name " Ganesh " chiefly rests with Nagendranath Vasu. We learn from him that the genealogical work of the Rāṛhi Brahmans named Mahāvaṁśa by Dhrubānanda Miśra (a book of great authority

of Krittivās. Thus Krittivās seems to have flourished partly in the 15th and partly in the 16th century.

Among those who believe Raja Kaṁsanārāyaṇ as the patron of Krittivās we may specially mention Kaliprasanna Banerjee and Pandit Rajanikanta Chakravarti; see "Madhya yuger Bānglā", pp. 11, 25, 26 by K P. Banerjee and "Gauṛer Itihas," part II, p. 213, ed. 1909 by R. Chakravarti. See also the Introduction to the Descriptive Catalogue, Bengali MSS., C. U., Vol. 1. But Dr. D. C. Sen is doubtful of this conclusion. According to him Kaṁsanārāyaṇ belongs to a later period than that of Krittivās. Kaṁsanārāyaṇ, he believes along with others, to belong to the 16th century.

so far as the Rāṛhi Brahman genealogy is concerned) mentions a powerful chief named Srī-Datta Khan who could be no other than Ganesh and whom he styled fully as Ganesh Datta Khan. He supports his view by saying that another genealogical work named "Sadānanda Kārikā" (a book of high authority with the 'Uttar Rāṛhiya' Kāyastha families) mentions the name Ganesh Datta Khan. To N. Vasu Śrī-Datta and Ganesh Datta are synonymous, and incidentally he tries to prove that Ganesh, who had been known so long as a Barendra Brahman, was not so, but a Kāyastha by caste. We cannot follow the line of argument of N. Vasu. Śrī-Datta might only be a contemporary of (and not identical with) Śrī Ganesh. Why can Srī-Datta be not taken as a name, we do not at all understand. This Śrī-Datta might be a name just as Śrī-Pati and Śrī-Manta are names. If it is a title, then why was the full name, *e.g.*, Śrī Ganesh Datta never mentioned by the genealogical work in question *e.g.*, Mahāvaṁśa? As for the title 'Khan' adopted by Ganesh there is no dispute. The genealogical list as given in Sadānanda-Kārikā is mentioned below:—
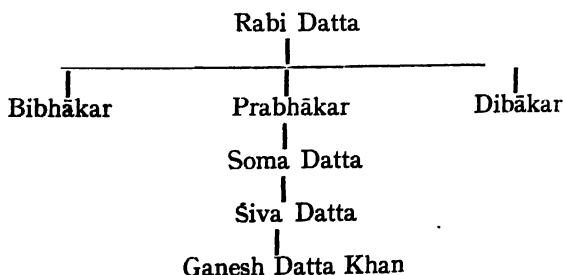
This genealogy is incomplete as it does not go to mention the names of the successor or successors

of Ganesh Datta Khan and as such does not stand the test of sifting enquiry. The contention that no two "Gauṛeswaras" like Ganesh and Datta Khan were possible at the same date, is baseless as this appellation was given by the court parasites in the past to any considerable landlord from whom they got any benefit of importance. To construct Śrī-Datta as Srī Ganesh is only a favourite theory with N. Vasu which, we regret, we cannot endorse. Incidentally let us mention that Durgachandra Sanyal quoted a few letters[1] (pp. 78-82) of the family of Ganesh in which it was distinctly mentioned that Ganesh was a Brahman, but, of course, where did he found those letters we do not know. Ganesh has long been regarded as a Barendra Brahman and Zaminder of Bhāturiā Paṛganah (Dt. Dinajpur) who occupied the throne of Gauṛ by killing Samsuddin II about which incident we sufficiently discussed hereafter. Besides the Datta Khan theory, N. Vasu has also speculated upon another person, Mahendra Deva. For many years N. Vasu constructed one theory after another about this Mahendra Deva. However, afterwards, he fell in line with the numismatic evidence, and we are happy to remark, that he at last believed that Mahendra Deva was neither the father nor the younger brother of Ganesh, but the son who was otherwise known as Jadu or Jitmalla and succeeded him to the throne.[2]

[*N.B.* Besides the two names Danujmardan and Datta Khan we find another name Kāns used by Abul Fazel. The last name has been long ago

---

[1] বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, pp 78-82.

[2] According to H. E. Stapleton Mahendra Deva might be a brother of Jadu.

put to the test of historical investigation and it has been finally accepted that Kāns is the variation of the name of Ganesh. Care should be taken not to confuse Kāns with Kaṁsanārāyaṇ, the Raja of Tahirpur, an influential Barendra Brahman and Zaminder of North Bengal, who flourished about 150 years after Raja Ganesh.]

In discussing the date of Raja Ganesh let us first give the following genealogical table from numismatic sources.

Azam Shah (reigned 1392-1409 or 1410 A.D.)
|
Saifuddin Hamza Shah
|
Sihabuddin Bayazid Shah
|
Alauddin Feroz Shah

But according to Rajanikanta Chakravarti, the writer of গৌড়ের ইতিহাস, who follows Riyaz, Saifuddin Abul Mujahid Hamza Shah reigned from 1393 to 1402 A.D. He was followed by Samsuddin II whom Ganesh, the Zaminder of Bhāturiā in Dinajpur district, dethroned, or according to some, killed in 1405 A.D. and reigned as king till 1414 A.D. Samsuddin, according to R. Chakravarti, reigned only for 3 years 4 months and 6 days. This writer chiefly followed Riyaz. But he referred to a puzzle. The coin of Sultan Sahabuddin Abul Muzaffar Bayazid Shah does not contain the name of his father, as is the common practice.

Now, according to Rajanikanta Chakravarti and his authority Riyaz-us-Salatin, Saifuddin was followed by Samsuddin II, while according to the coins, Saifuddin was succeeded by Bayazid. The

writer does not seem to be aware of the numismatic evidence and cannot definitely ascertain who was the father of Bayazid. R. Chakravarti surmised that Bayazid might have been Raja Ganesh himself. But he also quoted Blochman, who thought on the contrary that Bayazid was only the nominal sovereign while Raja Ganesh was probably all-powerful in the state during his reign.

Another writer on the subject, *viz.*, Durgachandra Sanyal, in his বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস gives the following genealogical list:—
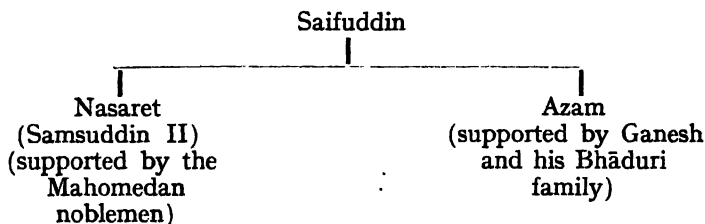
According to this writer, Nasaret, the son of Saifuddin by his second wife, was older than Azam, the son by his first wife. There was naturally a dynastic struggle which is described at length by the writer and in which, according to him, the Bhāduris (Ganesh's family) participated.

Sihabuddin Bayazid Shah was Samsuddin II (Iliyas Shah, the founder of the dynasty, being Samsuddin I) according to Minhazuddin's Riyaz-us-Salatin and Chakrabarti's গৌড়ের ইতিহাস, while Nasaret is identified with Samsuddin II by Durgachandra Sanyal. It has now been conclusively proved that Bayazid and Samsuddin II were one and the same person. Bayazid only adopted the title of Samsuddin II and was never known as Raja Ganesh. A curious episode has been related by

Durgachandra Sanyal following Riyaz that an influential Mahomedan Pir (Saint) invited Sultan Ibrahim, the ruler of Jaunpur, to dethrone Ganesh. The Sultan came accordingly. Ganesh, to appease both the Pir and the Sultan (Ibrahim) had converted his son Jadu to Islam and placed him temporarily on the throne by way of a political move. It attained splendid success, for the Pir was satisfied and Ibrahim left Bengal quite contented. In this circumstance Jadu reigned for only about two years while his father Ganesh re-occupied the throne in 1416 A.D. According to the writer of Riyaz, Ganesh died in 1418 A.D. If we give any credence to this theory, then Ganesh could not have reigned in 1405 A.D. In the coins issued by Jadu or Jitmal as Jelaluddin, we find the dates 818 Heg. and 819 Heg. (*i.e.*, 1415 A.D. and 1416 A.D.) when he ascended the throne during the life-time of Raja Ganesh.

As regards the date of Ganesh opinions of a conflicting nature exist making the problem as hard as ever. The writer of Riyaz places the reign between 1405-1414 A.D. But Durgachandra Sanyal wants to put the date of his actual coronation at 1414 A.D. Blochman suggested, as mentioned before, that Ganesh was the real ruler of the state for a long time even before his coronation in 1414 A.D. In that case Saifuddin and Bayazid could not have reigned for a long time and the period of reign attributed to Saifuddin (1393-1402 A.D.) and accepted by Rajanikanta Chakravarti seems to be untenable. As for Alauddin Feroz Shah, it may be safely surmised that he was probably trying the issue with Ganesh for some time, without any success. Some

would believe that Ganesh killed Ghyasuddin Azam Shah himself in 1407 A.D.[1] But from the coins we know that Ghyasuddin was living as late as 1409 A.D., and was succeeded by three generations of descendants. We are, thus, inclined to dismiss the theory with the remark that Ganesh was perhaps growing powerful even as early as the reign of Azam Shah.

From the mazes of theories, stories and hearsays with other more reliable but fragmentary evidences, numismatic and historical, it is very difficult to disentangle proper history.

However, recent historical researches have enabled us to get some new light on the subject. H. E. Stapleton wishes to put the date of Raja Ganesh's enthronement at 819 Heg. or 1416 A.D., and according to this scholar, he reigned at most for 5 or 6 years only, while according to Nalinikanta Bhattasali (his observations being based upon some coins) Ganesh could not have been on the throne of Gauṛ earlier than 817 Heg. (1414 A.D.) and could not have reigned after 821 Heg. (1418 A.D.; see প্রবাসী, ১৩৩০ সাল). So, these two scholars seem to have very little essential difference so far as the dates are concerned. These coins have been discovered in Maldah, Chittagong and in the locality of Subarnagrām. It is a significant fact that no coin in the name of Ganesh has yet been found. Many coins bearing the name of Danujmardan and dated 1339 *Śakābda* (1417 A.D.) and 1340 *Śakābda* (1418 A.D.) have been discovered.[1]

---

[1] Rajanikanta Chakravarti mentions one significant fact in his গৌড়ের ইতিহাস; it is, "আরাকানরাজ গণেশের সাহায্য করিয়াছিলেন," etc. To corroborate this statement we find that a coin in the name of Danuj-

If it is proved that Danujmradan and Ganesh were one and the same person then Ganesh was living and ruling as early as 1417 A.D. Again, according to R. D. Banerjee, Ganesh reigned between 1396-1415 A.D., being succeeded by Jadu. So no definite date for Ganesh can be obtained at this stage.

Inspite of all our attempts to give different versions current about Ganesh and his contemporary people, and to give a cogent version from amongst the conflicting theories, it may be said, that the political history of Bengal of this period is shrouded in mystery. No definite conclusion is safe at this stage of enquiry. Sufficient coins are not yet to be found, and these too, are sometimes manufactured by interested persons or parties, while the same may also be said with vehemence about the testimony of literature, specially the genealogical literature, covering any disputed period. However, the day may yet arrive when the coins and literature may both be profitably utilised to arrive at a safe and definite conclusion.

---

mardan has been discovered which was minted at Chittagong. These go to prove at some length the theory that Ganesh and Danuj were one and the same person. See also in this connection in addition to Rajanikanta Chakravarti's history, Bhattasali's "Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal".

A PAGE FROM OLD BENGALI LITERATURE

In nothing is a country's cultural progress indicated more than in her past literature. Fortunately, Bengal is rich in old literature which tells much of her past history. In it even a slight reference to an ordinary matter speaks more than the voluminous writings of historians. Thus not a little light is thrown by the poet Jadunandan Das (16th century) on the condition of female costumes and ornaments mainly of the Hindu period, in incidentally describing, in Bengali verse, the toilet of Rādhā, in his translation of Krishnadas Kaviraja's Sanskrit work, *Govinda Lilāmrita.*

The following is a poor rendering of some of the poet's exquisite lines from the above work:

The Toilet of Radha.

The maid Lalitā engaged herself in dressing the hair of Rādhā with a comb set with gems. She dried with resins her mistress's hair which was wet after a bath. The hair was of the finest quality, soft and curly. It always remained sweet-scented through the use of *"Aguru"* (*Aqularia Agolacha*). She further enhanced it by using various scents.

Lalitā next braided the hair and attached a bright stone to its tip, making it resemble a serpent with a lustrous gem on its hood. On it were placed two garlands, one of Bakul flower and the other of pearls. Thus the three (namely, the braid, the flower-garland and the pearl-garland) might fitly

be compared to the "*Tribeni*".[1] All the three were intertwined with a silk-tape and tied at the back of the neck with a piece of gold thread.

Rādhā then wore a thin red cloth as an underwear over which she put on a blue śāṛi. The name of this fine sāṛi was *Meghāmbar* (literally, the cloth having the colour of the cloud) and it resembled the black bee, in colour. The style, in which she put it on, would elicit praise from everybody. The tuck of her cloth was really unparalleled. Its upper part was tied with a gold thread which was again covered with a deep red silk-tape. Around her loins she wore a net-like gold ornament inlaid with precious gems. It enhanced the beauty of the wearer beyond comparison.

Now the work of Lalitā was over and the maid Bisākhā stepped in. The latter made a paste of sandal, camphor and *aguru* of Kashmir and rubbed it on the beautiful person of Rādhā. The gentle maid painted musk-pictures on the sides of her thigh with great care. After this she occupied herself with the leaf-painting on the forehead of her lady with the help of musk and put a nice vermilion-mark just below this. Under this she put a sandal-mark in the centre of which she again put a dot of musk. She also did not forget to paint the hair-parting on the head with vermilion, the redness of which had exquisite effect amidst the luxuriant dark hair of Rādhā.

Next came the turn of the maid Chitrā. She painted a fine picture on the breast of Rādhā. It

[1] The confluence of the three rivers, namely, the Ganges, the Jamuna and the Saraswati.

was that of *Madan-Vasma.*[1] The following was the picture:

Above—the crescent moon rose in heaven, and below—a tuft of flowers with newly sprouted leaves exhibited the beauty of the early spring. One would not miss there a charming lake full of lotuses and fish. Lastly, there was the bow and arrows of the god of Love with which he kept himself alert to aim at his mark.

Rādhā put on her breast a purple corset which was studded with pearls. The red rubies decorated the two nipples of her breast. The colour of the rubies would remind one of the evening which becomes red without being dark due to certain physical phenomenon.

The person of Rādhā was decorated with ornaments of much beauty. Firstly, a pair of palm-leaf-like gold-ring, with a sapphire resembling a blue flower on each of them, was put on her ears. This ornament (Tāṛanka) was so fine that it might have been mistaken for a lotus, by the black bees. On the upper part of the ears the golden ornament "Chakri" shone brightly. This ornament had pins all around which dazzled like pencils of light. Its beauty was unparalleled, the more so, as the pearls surrounded the azure gem at the centre, above which there was a diamond of much brilliancy. Krishna liked the ornament very much and so Rādhā wore it.

Then Bisākhā dotted the cheeks of Rādhā with musk. Its beauty would remind one of bees on a lotus of gold. The "Beshara" or nose-ornament

[1] Burning of the god of Love Madan when he tried to disturb the meditation of the great God Siva.

was made of gold and a big pearl was attached to it which displayed its worth just on the tip of her nose. As the "Neal" fruit with stalk would seem beautiful in the beak of the bird Śuka so did the nose-ornament of Rādhā.

Rādhā's big eyes were painted with collyrium. What should be said of its beauty! It seemed the bird "Chakora"[1] was waiting wistfully to drink the nectar out of the moon—the moon-like face of Srikrishna—Radha's lover. The golden necklace was then brought by Bisākhā to decorate the incomparable neck of Rādhā.

Her neck, which resembled that of a swan, was ever afraid of conches. Krishna's palm had the sign of a conch which is always regarded as very auspicious.

Krishna had the best claim to the sign of a conch as he was also the god Vishnu whose one hand bore the great conch. The poet says that, perhaps in fear of Krishna's conch Rādhā's swan-like neck was covered with a necklace. The necklace was made of sapphires interspersed with diamonds and it was thick in the middle and pointed on one side. The thread used for the necklace was golden. There were tufts of pearls attached to it, one of which decorated the breast of Rādhā. The gay Rādhā then wore the "Goonjā" (*Abrus precatorious*) garland which was once presented to her by Krishna himself.

The necklace named "Ekābali" which also Rādhā put on had a thread of gold. It had stones of much brilliancy which shone like stars in the firmament. The pendants made of "Indranil" gems

---

[1] Radha's Eyes.

(perhaps a kind of sapphire) and known as " Chatuska " were all connected with a chain. The silk-tape (used to bind the hair) decorated with precious stones, such as " Padmarāg " (perhaps a kind of ruby), hung at her back and brought into prominence the mass of black hair that Rādhā possessed.

Bisākhā brought the golden " Angada " (armlets) for the arms. These were tied with black thread which was not of an ordinary type but was inset with valuable stones. Thus it brought into high relief the bright " Angada ". In the two arms she wore bracelets containing blue gems. Their beauty was that of a red lotus over which the bees were constantly humming. The golden " Kankan " was mounted upon it. Above it pearls encircled the hands. The yellow colour of gold and the white colour of pearls looked like a combination of the sun and the moon.

The golden " Māduli " looked beautiful on the upper part of the arm. Then she wore a ring of precious stone on which was inscribed the " Vanquisher of the enemy". On her feet Rādhā wore " Kataka " which looked dazzling owing to the inset of bright jewels. After that she put on " Ratanmanjari".

On the fingers of the feet she wore " Ujjhatikā " of precious gems. Narmadā, the gardener's daughter, presented a blue lotus and a garland to Rādhā which Bisākhā handed over to the latter. The garland was beloved of Sri Krishna. Finally, Sugandhā, the barber-girl, presented Rādhā with a mirror in which she saw her peerless beauty reflected, to the admiration of all.

THE MARITIME ACTIVITIES OF ANCIENT BENGAL

In ancient Bengal ship-building reached a high stage of perfection and the sea-going vessels were actively engaged in promoting the prosperity of the country by conducting commercial intercourse with various places within and outside India.

From the descriptions that one comes across in the works of our poets it appears that the merchandise carried in Bengalee vessels was mainly intended for export to Patan and Singhal. A system of barter was generally resorted to and fraud played by the Bengalee merchants on foreigners of questionable civilization, furnished a stock of humour and fun to our poets, on which all of them wrote in the same strain. We find occasional mention of merchandise wherein the prices are sometimes ludicrously exaggerated, for, during the time when these works were written, sea-voyage was reduced to a vague tradition in which facts and fiction were hopelessly blended together. Still we give below two lists which may be found interesting as they no doubt contain some elements of truth. According to Baṁsidas and other poets, it was the Bengalee merchants who introduced cocoanuts and betels in some foreign countries, which seems to be nothing but a myth.

Items of Bengalee Merchandise

First List

(1) Each betel-leaf in exchange of ten emeralds.

(2) Betel-nut in exchange of ten gems.

(3) Lime in exchange of Quick-silver.

(4) Catechew in exchange of Gorachanā (a bright yellow pigment).

(5) Cardamom in exchange of Pearl.

(6) Satābari Kameswar (Asparagus racemosus) in exchange of Musk.

(7) Fruits in exchange of Golden bricks, bells, etc.

(8) Vegetable-roots in exchange of Diamond.

(9) Pulses in exchange of Corals.

(10) Onions and garlics in exchange of Maces.

(11) Camphor in exchange of Bākhar.

(12) Water-weeds in exchange of Diamond.

(13) Dolichos gladiatus (Mākhana fruit) in exchange of Ruby.

(14) Goats and sheep in exchange of Gold.

(15) Radish in exchange of Ivory.

(16) Dry fish in exchange of Sandal-wood.

(17) Sugarcane in exchange of Royal maces (nabadanḍa, a symbol of royalty).

(18) Jute in exchange of Chowrie (Chāmar).

(19) Wooden utensils in exchange of Gold and Silver utensils.

(20) Wooden furniture in exchange of Golden furniture.

(21) Earthenwares in exchange of Bell-metals utensils.

(22) Oil and clarified butter in exchange of Quick-silver.

(23) Kumkum in exchange of Jarful of honey.

(24) Poppy in exchange of a string of Gold-bells etc., etc.

For a reference to the above list, see Baṁsidas's Manasā-mangal, pp. 380-390 and 392-393 (D. Chakravorti's ed.).

Second List

1. Deer in exchange of Horse.
2. 'Biranga' in exchange of Cloves.
3. Suntha in exchange of Tanka—a kind of wood-apple (Feronia Elephantum).
4. Ape in exchange of Elephant.
5. Pigeon in exchange of Sua (a Parrot).
6. Fruits in exchange of "Jāyfal."
7. Baheṛā in exchange of Betel-nut.
8. Jute in exchange of White Chowrie (Chāmar).
9. Glass in exchange of Emerald.
10. Sea-salt in exchange of Rock-salt.
11. Dhuti (cloth) in exchange of Pots.
12. Oyster-shell in exchange of Pearl.
13. Harital in exchange of Diamond.
14. 'Joāni' in exchange of "Jirā."
15. "Chua" in exchange of Sandal-paste.
16. Sheep in exchange of Horse.

See for the second list Kavikankan Mukundaram's Chandi-Kavya, p. 191—Dhanapati's exchange of merchandise in Ceylon. The exchange of commodities here seems to be somewhat more reasonable than that to be found in Baṁsidas's work.

GLASS INDUSTRY

It is to be noted that there was a time when glass used to be exported from India. We learn the following in the Periplus of the Erythrean Sea,

pp. 220-221 (by W. H. Schoff, A.M., Longmans Greens and Co., 1912).

"The origin of the glass industry in India is uncertain. According to Mitra, Antiquities of Orissa, I, 101, it was made in Ceylon in the 3rd century B. C. and Pliny (XXXVI, 66) refers to the glass of India as superior to all others, because made of pounded crystal. Mirrors, with a foil of leas and tin, were largely used at the time of the Periplus, and Pliny indicates (XXXVII, 20) that 'the people of India, by colouring crystal, have found a method of imitating various precious stones, Beryls in particular.' An early play, the Mrichhakatika, or Little Clay-Cart, describes a scene in a court of justice to this effect (Mitra, 100; see also A. W. Ryder's translation, Cambridge 1905)."

The Bengalee merchants usually carried on trade with Ceylon and Patan in Guzrat and visited the following ports:

1. Puri.
2. Kalinga or Kalingapatam.
3. Chilkachuli or Chicacole in the Madras Presidency.
4. Banpur.
5. Setubandha Rameswar.
6. City of Lanka (in Ceylon).
7. Nilacca or Laccadives.
8. Patan (in Guzrat).

One of the chief places outside India visited by the Bengalee merchants was the Laccadives. Mention is found also of Pralamba, Nakut, Ahee Lanka, Chandrasalya island and Abartana island which we cannot identify but which undoubtedly lay outside the limits of our country. A vivid description

of the coasting voyage of the Bengalee vessels from Saptagram (an inland port of Bengal) to Patan in Guzrat by doubling the Cape Comorin, is found in the Manasāmangal poems of Baṁsidas. In the Chandikāvya of Kavikankan Mukundaram we find accounts of mercantile adventurers of Bengal related in glowing terms. The lists of ports, both Indian and foreign, and the conditions of sea-voyage tally in both these works.

Voyage of Chand

In Baṁsidas we find the following description of the voyage of Chand, the merchant. Inspite of poetic fancy and exaggeration, a rough idea of the sea-routes adopted and ports once visited by vessels of Bengal may be gleaned from it.

"The merchant started for south Patan. There were great celebrations and festivities at the City of Champaka. All the ships started one after another. At the head of the vanguard was admiral Gopal with forty-two small vessels. After leaving his own territory Chand passed through the following places in succession e.g., Kamarhati, Madhyanagar, Pratapgarh, Gopalpur and Ramnagar. He then reached Kalidah-Sagar which he crossed leaving to the right Gandharvapur and to the left Birnagar. Then the merchant reached the mouths of the Ganges after passing through Kameswar, Māndārerthana, Pichalta and Ram-Bishnupuri one after another. At Gangasagar Chand performed his worship and sacrificed goats. After leaving Champaknagar the ships were on the voyage for five months. The merchant passed through many difficult places after having

reached the sea. He passed through Utkal and Kalinga on his right. Crabs, lobsters, leeches and crocodiles obstructed his passage through the malice of Manasa Devi. At last the merchant reached the golden Lanka surrounded by golden walls. Chand here saw the Rakshasa king and received his passport before proceeding further. Then he left Lanka on his right and passed the Malaya mountain near Cape Comorin. He also passed Bijaynagar (Ceylonese?) then ruled by King Ahi. The next important place which the merchant visited was Parasuramtirtha. Leaving this place the merchant reached the vast sea known as the Nilaccārbunk (lit. bend of sea near Nilaccā—perhaps Laccadives). Reaching this sea the crew felt giddy as they heard the deep sound of the waves which rose as high as mountains. They almost lost their way, but through the expert direction of Captain Dulai the vessels were steered properly. It was by looking at the stars that Dulai could keep to the right direction. After much trouble, the merchant Chand and his companions reached the City of Patan, then ruled by King Chandraketu."

On Chand's way back from Patan, he crossed the Laccadives, then passed the Vindhya-ranges, Lanka, Setubandha-Rameswar and reached Kalidaha-sagar where he experienced a heavy storm.

The above description leads us to the conclusion that Patan, once a celebrated city in Guzrat, was frequented by the merchants of Bengal who reached the place by sea crossing the Bay of Bengal, part of the Indian Ocean and the Arabian Sea. The voyage was probably a coasting one and Ceylon which stood midway between Bengal and Guzrat by

the sea-route, was a favourite place of commerce for the merchants of Bengal. Patan was not an inland city similar to Tamralipti or Tamluk which was once one of the most important sea-ports of Bengal. Though Patan means a city yet the frequent mention of this particular Patan and the way leading to it, makes us think that it is no other than the Patan or Somnath Patan of Guzrat, and not a fanciful creation of our poets.

Another account of the voyages of the old Bengalees (as found in Kavikankan's Chandikavya, pp. 195-202) runs thus:—

"After the performance of the usual ceremonies before sailing, the merchant Dhanapati passed the following places: Bhowsingerghat, Mātiārisafar, Chandigāchhā, Bolanpur, Purathan, Nabadwip, Mirzapur, Ambua, Santipur, Guptipara, Ula, Khishma, Mahespur, Fulia and Halisahar—all by the side of the Ganges. Then he reached the very celebrated inland port of Bengal known as Saptagram near the Tribeni. The poet here incidentally praised this port and gave it a superior place among the following ports and places (some of which are Indian and some foreign) known to the poet. They were the ports of Kalinga, Trailanga, Anga, Vanga, Carnat, Mahendra, Magadha, Maharastra, Guzrat, Barendra, Vindhya, Pingal, Utkal, Draviṛ, Raṛha, Bijoynagar, Mathura, Dwaraka, Kasi, Kankhal, Kekaya, Purabak, Anayuk, Godabari, Gaya, Sylhet, Kamrup, Koch, Hangar, Trihatta, Manika, Fatika, Lanka, Pralamba, Nakutta, Bagan, Malay (Indian), Kurukshetra, Bateswari, Ahulanka, Sibatatta, Mahanatta and Hastina, etc. According to the poet, the merchants of the above places visited Sapta-

gram, but the merchants of Saptagram did never visit those ports and places (these prove the exaggerated notion of the poet about Saptagram).

At Saptagram the merchant took on board sufficient drinking water for his voyage; he then passed some other places of note by the river banks, such as Nimaitirtha, Betarah, Bagan, Kalighat, Ambulinga, Chhatrabhoga, Kalipur, Himai, Hetagarh, Sanketamadhaba, Madanmalla, Birkhana, Kalihati and Dhuligram. On his way he encountered storm on the river Magṛa. It took the merchant twenty days to reach the canal of Angarpur. Then his vessels entered the sea adjoining the country of the Draviṛas. The first place of note was Puri, celebrated for the temple of Jagannath. Then the merchant visited Chilkachuli or Chicacole. Next ports of note were Balighata and Banpur which were soon left behind. They then reached the land of the Firinghees (Portuguese). They stealthily passed this place under cover of darkness at night, as they were afraid of these people who were very strong for their fleet of warships which were known as the "Harmada" (Portuguese Armada, the Portuguese being very strong in pirate ships in these parts). Dhanapati then passed some seas which were infested with crabs, snakes and crocodiles, etc., like Chand. After much difficulty he reached Lanka. Before reaching Lanka, however, Dhanapati's vessels touched Setubandha-Rameswar and crossed Kalidaha or Black-watered Sea."

It is peculiar that Kalidaha which Baṁsidas mentions to be near Bengal Kavikankan places near Ceylon. It may be that any expanse of blue sea

was called by them "Kalidaha." As for the mention of Harmadas, it may safely be said that they are matters of history. The Portuguese pirate-vessels were for some time the curse of the eastern sea.

In the voyage of Srimanta, son of Dhanapati, we come across the names of two islands, namely, Chandrasalya and Ābartana, both lying on the way to Ceylon. We cannot locate these islands as we cannot locate Banpur 'en route' to Chand's voyage, for obvious reasons. Though there is evidently much exaggeration about the size of the ships, it is quite probable that the vessels belonging to ancient Bengalee merchants were often of enormous size, for the bulk of ships counted very much during those days. The old Bengalee poets had some traditions of the past, to which they added much that they derived from their imagination. In one of the ballads of Mymensingh, it is mentioned that a vessel was called Koshā, because its length was two miles (a "krosha"). Of course, it is almost absurd to suppose that any single vessel could be of such a huge shape, but it is not unlikely that in ancient times when there was a fashion in the civilised countries such as Egypt and Babylon, and as a matter of fact all the world over, in constructing huge and titanic vessels, a full fleet was sometimes made to cover a space of more than a mile, the tradition of which still lingers in the name of pleasure-boats, known as the " Koshā."

———

THE NOBILITY OF BENGAL IN OLD BENGALI LITERATURE

In this article I have confined myself to finding out the various references, in old Bengali literature to the Hindu and Moslem Rajas and Chiefs of the period between the 14th and the 18th centuries.

Vidyapati (14th—15th century) :

(1) Says the Poet Vidyāpati—It is known to Nasira Shah, who is pierced with the arrows of Cupid. Let the Lord of the five Gauṛas live for ever.[1]

—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 28.

(2) How long may the theft, which is already found out, be kept a secret? Sultan Gyasuddin knows of it. Let him live long.[2]

—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 163.

---

[1] "নসীর সাহ ভানে,
মুঝে হানল নয়ন বানে,
চিরজীঁব রহু পচগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।"
—বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ২৮ পৃঃ

[2] "বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভান্।
মহলম জুগপতি চিরজিব জীবথু
গ্যাসদেব সুরতান॥"
—বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ১৬৩ পৃঃ

(3) Let Malik Baharuddin understand it.[1]
—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 268.

(4) Says the new 'Kavi-Sekhar' (*lit.* Chief of Poets) Vidyāpati—Where can there be another rival where Hussain Shah himself stands as the lover of amorous girls like a bee among the 'Mālatī' flowers.[2]
—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 297.

(5) Vidyāpati is describing this before Kaṃsanārāyan* and Saramā Devi.[3]
—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 321.

(6) Let the Lord Alam Shah forget himself in his attention to his lover like a bee on a lotus.[4]
—Vidyāpati, N. Gupta's Ed., p. 529.

---

[1] "মলিক বহার দিন বুঝ ঐ ভাব।"
—বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ১৬৮ পৃঃ।

[2] "ভনই বিদ্যাপতি নবকবিশেখর
পুহুবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সৈনিক জঁহা॥"
—বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ২৯৭ পৃঃ।

[3] "বিদ্যাপতি ভন কংস নারায়ণ
সোরমা দেবী সমাজ।"
--বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ৩২১ পৃঃ।

[4] "আলম সাহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা॥"
—বিদ্যাপতি (নগেন গুপ্ত), ৫২৯ পৃঃ।

* This Kaṁsanārāyan was a different person from Kaṁsanārāyan of Tahirpur (Dinajpur District, North Bengal) as the latter flourished at a much later date.

Rami (the washer-woman and sweetheart of *Chandidas*):

(Concerning the death of Chandīdās; 14th or 16th century?)

(7) Raja (of Gauṛa?)* ordered his minister to bring an elephant immediately and tie the enemy (Chandīdās) on its back. Then he further gave orders to lash him to death when in that situation. Being a helpless woman what else could I do than cry aloud calling your name? I was then standing by a 'Mādhabī' creeper and holding a branch of it in my hands. The elephant moved on very swiftly and thus I missed seeing you any more. The sad incident was like falling of a thunderbolt on my head. Witnessing the scene the Ranee exclaimed, "O my love, do not leave us in this manner." Saying this, she breathed her last. Thus both of them died at the same time.[1]

—Rāmī, (Hist. of Bengali Lang. & Lit., D. C. Sen—Bengali).

---

1 "রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরান্বিত হস্তি আনি পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ঠ খুন্দ্রে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডাল ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্তি চলে অতি জোরে ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥

* The reference is to a local ruler or to a ruler of Gauṛa (?) and the poet Chandidās.

Sañjaya (probably flourished in the 14th century) :

(8) The metre of Sañjaya's Mahābhārata is like sweet nectar and deals with sacred topics. Its last canto contains the biography of Lord Krishna.[1] Jagadānanda always worships the god Hari and the poet Sasthībar describes the incidents of Hari's life to all.

—the Mahābhārata by Sañjaya,
Bengal Govt. MS., fol. 789.

Bhabanidas (written in the 14th century?):

(9) Says Bhabanidas (who expresses his devotion to the feet of Ramchandra) by command of Raja Jaychandra.[2]

—Lakshman-Digvijay (Rajanikanta
Banerjee's Ed.), p. 122.

রাণি কহে ছাড়িয়া না জায়।
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রাণ একত্রে মিলায়॥"
—রামী (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন)।

1 "অমৃতলহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণর চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরিবন্দে, কবি ষষ্ঠিবর কহে সর্ব্বে॥"
—সঞ্জয়ের মহাভারত, বে, গ, পুথি, ৭৮৯ পত্র।

2 "কহেন ভবানীদাস, শ্রীরামের পদে আশ,
জয়চন্দ্র রাজার বচনে।"
—লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ
(২৮৫, অপার চিৎপুর রোড), ১২২ পৃঃ।

Krittivasa (15th-16th century) :

(10) The Lord of Gauṛa rules all the five lands of the same name. In worshipping the Lord of Gauṛa one worships nothing but virtue.[1]

—The Rāmāyana by Krittivāsa,
Poet's Autobiography.

Maladhar Basu (work completed in 1480 A.D.) :

(11) I have no qualities and have no village in possession. My title Gunarāj Khān (*lit.* Possessor of all virtues) has been bestowed on me by the Lord of Gauṛa.[2]

—Preface of the Bhāgavata (Trans.)
by Mālādhar Basu.

Bejoy Gupta (composed in 1494 A.D. ?);

(12) The Sultan Hussain Shah is the best of all princes.[3]

—Manasāmangal by Bejoy Gupta,
p. 4. (Pearymohan Das Gupta's Ed.)

---

1 "পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥"
—কৃত্তিবাসের রামায়ণে কবির আত্মবিবরণ।

2 "নির্গুণ অধম মুঞি, নাহি কোন গ্রাম।
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজখান॥"
—ভূমিকা, মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ।

3 "সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক।"
—বিজয় গুপ্ত (প্যারীমোহন দাস গুপ্ত সম্পাদিত), ৪ পৃঃ।

Kavindra Parameśwara:

He composed the Mahābhārata during Hussain Shah's reign (1494-1525 A.D.).

(13) The Sultan Hussain Shah is a great personage. He has great reputation in the Five Gauṛas. He is well-up in arms and his good qualities are beyond description. He seems to be the Lord Kriṣṇa of 'Kali Yuga.' The Sultan is the Lord of Gauṛa. The name of his general is Laskar Parāgal Khān. This Laskar is a very high-minded person. He received presents of golden cloth, swift-running horses and land from his sovereign as marks of favour. Thus he came to settle in Chittagong in good spirits. The much-respected Khān rules there being surrounded by a big family. He cheerfully listens to the recitation of the Mahābhārata every day.[1]

—Kavīndra's Mahābhārata, MS. of
Bengal Govt. f. 88.

---

1 "নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করি বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥

(14) His Majesty Hussain Shah is the Lord of the Five Gauṛas. He subjugated the kingdoms of Tipperah and Dwarika (?).[1]

—Parāgal Khan's Mahābhārata (Kavīndra).

(15) The great family of the Rudras is like an ocean. The Laskar Parāgal Khān was born in this family like the moon out of the sea. Kavīndra Parameswara composed this excellent Mahābhārata in 'Payar' metre.[2]

—Kavīndra's Mahābhārata.

(16) Long live His Excellency Parāgal Khan who is (like?) a Kshatriya general.[3]

—Kavīndra Parameśwara.

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥"

—কবীন্দ্রের মহাভারত, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি, ১ম পত্র।

1 "শ্রীশ্রী হোছন সাহা পঞ্চগৌড় নাথ।
ত্রিপুর দ্বারিকা সমর্পিলা যাহাত ॥"

—পরাগলী মহাভারত (কবীন্দ্র)।

2 "রুদ্রবংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম সুধাকর
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে,
বিরচিত ভারত বাখান ॥"

—পরাগলী মহাভারত (কবীন্দ্র)।

3 "খান শ্রীপরাগল সজীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতিঃ।"

—কবীন্দ্রের মহাভারত।

Dwija Bipradas (from Abdul Karim's collections):

Date of composition—last part of the 15th century.

(17) In the month of Baisakh and in the night of the tenth quarter of the full moon, the goddess Padmā appeared before me and sat near my pillow, when I was lying in my bed, and advised me to compose one 'pānchāli' in her honour. It was her command which was the only source of my inspiration inspite of my shortcomings to be equal to the occasion. I composed this in 1417 Saka (or 1495 A.D.) when the lucky Sultan Hussain Shah (date of reign 1494-1525 A.D.) occupied the throne of Gauṛa.[1]

Srikaran Nandi (composed in the latter part of the 15th or the early part of the 16th century):

(18) There is a principal place on earth where there is neither drought nor excessive rain. Nasarat Shah's father Hussain Shah is the great ruler of the place who rules his kingdom with pro-

---

1 "শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলক্ষণ ॥"
—দ্বিজ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল।

মুন্সী আব্দুল করিমের বাঙ্গালার প্রাচীন পুথির বিবরণ হইতে, ২২ পৃঃ।

verbial justice like Ramchandra of Ajodhya. Hussain always follows the well-known principles of politics as enjoined by the Sāstras. His general named Laskar Chhuti Khān once attacked the kingdom of Tipperah. Chhuti Khān's father built a beautiful city with a residence of his own, on the Hill of Chandranāth, just to the north of Chittagong. People flocked into his newly established capital and became his subjects. The river 'Phani' (*lit.* a snake) encircles it completely. To the east of it there is the long range of high hills.[1]

---

[1] "পৃথিবীর মোক্ষ পবিত্র একস্থান।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল॥
নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ যেঅ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালএ বসুমতি॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারুলোল গিরি তার পৈতৃক বসতি।
বিচিত্র নির্ম্মিল তাক কি কহিব অতি॥
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসএ তথাত॥
ফণী নামে নদী এ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তার॥

Chhuti Khān is the son of Laskar Parāgal Khan and very valiant in war. His broad chest, long arms reaching down to the knee and attractive gait, like elephant when walking, are remarkable. He is master of all arts and receptacle of all the virtues. He is God's especial creation. His charity may be compared to that of the celebrated Karna. In bravery and gravity befitting a man of his position, he is incomparable. On hearing of his rare qualities the Sultan once summoned him to his presence to reward him. The Sultan loaded him with honours and rich presents which included very

---

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিশাল হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্রগমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণসম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক যে সীমা॥
তাহার কত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুঠিখান॥
লস্কর বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদান-দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুরনৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

good horses and military Jaigirs. He administers the latter in accordance with the four political principles of the Hindu Sāstras. The ruler of Tipperah dreads him so much that he has retired to the inaccessible hilly parts of his kingdom. The Rajah of Tipperah honours him with costly presents, such as the elephants and horses. Although the Laskar now remains peacefully in his capital which is built in the midst of a deep jungle, yet the Rajah of Tipperah remains in apprehension of him. The Laskar now passes his days very happily and constantly receives the royal favour which is being multiplied every day. It will thus go on increasing to be enjoyed by his descendants.

গজ বাজী করী দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহাপতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি।
আপনে নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজ-সম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি॥
অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥

The Laskar is a great patron of learned men who adorn his Court. Once, while he was in his court surrounded by his friends and scholars, he desired to hear the sacred Mahābhārata as related by the sage Jaimini. Listening to the " Aswamedha-parba " with much interest—the Laskar ordered for a Bengali translation of the same by way of making his name famous. At his command Srikaran Nandi composes this poem in Bengali " payar " metre.

—Chhuti Khan's Mahābhārata (D. C. Sen & B. Kavyatirtha's Ed.), Aswamedha-parba, p. 1.

Madhabacharyya (Composed in 1579 A.D.):

(19) The land of the Five Gauṛas is the best part on Earth. Akbar is the ruler of this land and he is the incarnation of Arjuna.[1]

—Chandikavya by Madhabacharyya (Chittagong edition), p. 8

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥"
—ছুটীখানের মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব,
মঙ্গলাচরণ, ১ পৃঃ।

1 "পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥"
—মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য (জাগরণ,
চট্টগ্রাম সংস্করণ, ৮ পৃঃ।

Kavikankan Mukundaram (composed in 1589 A.D.):

(20) (a) Raghunath of sterling merits is the Indra of Brahmanbhumi. The poet Mukunda who is a courtier of his, sings the song after composing it in a nice manner.[1]

—Kavikankan's Chandikavya, 'Bhanitā', p. 24.

(b) Pathetic appeal of the lower animals to the goddess Bhagabati,—

O kind-hearted mother, save us from the embarrassments of this world. It is by appealing to you only, we can hope to tide over the difficulties. I am only a petty bear who devour the ants of the ant-hills and not a big person holding substantial property (taluqs) like the Neogies and the Chowdhuries. (Here the poet attacks the oppressive land-holders of his country humorously.)

—Kavikankan's Chandikavya, Bear's Appeal, p. 54.

---

[1] (*a*) "শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণ ভূমের পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
গানঁ মুকুন্দ কবিবর॥"

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, (বঙ্গবাসী সং) ২৪, ৩৪, পৃঃ।

(*b*) "দয়াময়ী পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ্ প্রতিকার॥
উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥"

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, ৫৪ পৃঃ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

(c) In the town of *Silimabaj* there lived the honest Gopinath Niyogi. The village Damunya which was within his taluq, was the home of my forefathers who lived there for some six or seven generations. I was also living there—the abode of my ancestors—and carrying on a farmer's profession. All honour to Raja *Mansingh* who was like a bee in the lotus-feet of the God Vishnu (meaning staunch Vaisnava) and was the ruler of Gauṛa, Vanga (East Bengal) and Orissa. Unfortunately under the rule of such a pious ruler, *Mamud Sharif* became 'Dihidar' (a local officer) of Silimabaj. Evidently this was due to the sin of the tenants and not to any misgovernment on the part of the pious Raja Mansingha. The Vizier acted like a prince (Rayzada) and was very unpopular as he oppressed the merchants; he was very hostile to the Brahmans and the Vaisnavas. He was also very unjust

---

(*c*) "সহর সিলিমবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্যায় চাষচষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে,
ডিহীদার মামুদ সরিপ॥
উজির হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥

in the measurements of lands and grains. He would never listen to the prayers of the tenants. The Government became so very tyrannical that it recorded a less productive land as very fertile and took recourse to exactions from the tenants without doing them any good whatsoever. The goldsmith (who was also the village 'mahājan' or money-lender) was also so veritable a devil that he took ten pice in every rupee when one went to him for some change, and one pie per day for every rupee he lent to others. The Dihidar Mamud Sharif was such a terror in the locality that owing to his oppressions nobody went out to work even if offered payment beforehand and nobody bought cows and paddy. My master Gopinath Nandi fell in extreme difficulties and was put under arrest. There was no rescue for him. The soldiers were ordered to establish

সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি ।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে ।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা ।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥

themselves in every tenant's house so that they might not flee from their quarters. Thus they were put to a very abject condition and were obliged to sell every household utensil that they could manage to do. They sold even the very ordinary hatchet and a rupee worth of articles on ten annas only. I got the help of Srimanta Khan of Chandibati who on his part took the advice of Munib Khan. With their friendly help I left my village Damunya with my brother Ramānāth when goddess Chandi met me on the way.

—Kavikankan's Chandikavya, (Poet's autobiographical accounts) p. 6 (Bangabasi Ed.)

(d) I have seen Kalinga, Trailinga (Telingana?), Anga, Vanga, Karnat, Mahendra, Magadh, Maharashtra, Gujrat, Barendra, Bandar, Vindhya, Pingala, Utkal, Dravida, Rarha, Bijaynagar, Ma-

---

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥"

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী সং), ৬ পৃঃ।

(*d*) "কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল শফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর ॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরবক অনায়ক গোদাবরী গয়া ॥

thura, Dwaraka, Kasi, Kankhal, Kekaya, Purabak, Anayak, Godavari, Gaya, Sylhet, Kamrup, Koch (Koch-Behar?), Hāngar, Trihatta, Mānikā, Fatikā, Lanka, Pralamba, Nakutta, Bāgan, Malaya, Kurukshetra, Bateswari, Ahulanka, Saptagram, Sivā-tatta, Maha-Natta and Hastina—besides other places the names of which are difficult to exhaust. Many merchants live in these places or visit these places with ships. The port of Saptagram stands pre-eminently above those places inasmuch as the merchants of Saptagram never visit other places because they have no need to do so, while the merchants of other places visit this port with merchandise. The Saptagram-merchants get happiness

শ্রীহট্ট কাঙুর কোঁচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মণিকা ফটিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট॥
বাগন মালয়দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম॥
শিবাতট্ট মহানট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত সফর কহিতে কত পারি॥
এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
জঙ্গ * ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্তে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥"

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী সং), ১৯৬ পৃঃ

* জঙ্গ, Chinese *Junk* boat (?).

and spiritual bliss by remaining in their own native port. Saptagram is even the best of all holy places and is ruled by the religious injunctions of the seven " Rishis".

—Kavikankan Mukundaram's Chandi-kavya, p. 196, (Bangabasi Ed.)

Rasaraj Khan (composed probably in the early 16th century) :

(21) His Majesty the Sultan Hussain of Bengal, who is the ornament of earth, knows this 'Rasa' (emotion) well. Says Rasaraj Khan—Let the Lord of the Five Gauras enjoy his fortune like a second Indra.[1]

—Rasamanjari by Rasaraj Khan, p. 8.

Krishnadas Kaviraj (completed his work in 1615 A.D.) :

(22) (a) The Mahomedan Lord of Gaura said the following on hearing the extraordinary influence of Chaitanya Dev[2] :—

---

[1] "শ্রীযুত হসন জগত ভুসন,
সোহ্ এ রস জান ।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর,
ভণে রসরাজ খান ॥"

—রসমঞ্জরী (রসরাজখান), ৮ পৃঃ ।

[2] (*a*) "গৌড়েশ্বর যবনরাজা প্রভাব শুনিঞা ।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায় ।
সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

"The gathering of people in large numbers around Chaitanya Dev, though they do not receive anything from him, shows that the man must be a saint. Henceforth I command the Kazis and Mahomedans in general not to molest this man. Let him speak anything he desires." The Sultan enquired of Kesab Chhatri about the Lord Chaitanya. To save Chaitanya Dev from any suspicion on the part of the Sultan, Keshab Chhatri, who was secretly a staunch follower of the Lord, said, "Chaitanya is a common Sannyasi and a beggar. Only a few persons come to see him. Your Majesty's co-religionists unduly magnify the real state of affairs. It is no use annoying him for nothing." Thus consoling the Sultan, the Chhatri sent a Brah-

---

কাজি যবন কেহ ইহার না কর হিংসন ।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইঁহার মন ॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল ॥
ভিক্ষারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন ।
তারে দেখিবারে আইসে ছুই চারিজন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগনি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ।
বলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমারে গোসাঞা ।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা ॥

mań to Chaitanya Dev confidentially, to inform him about the state of affairs in the Capital and the attitude of the Sultan. The Sultan then privately asked Davir Khas (his minister) of Chaitanya Dev. Davir Khas replied in glowing terms about the saint. He said, " It is the Lord Chaitanya who has bestowed a kingdom on the Sultan. It is through the good luck of the Sultan that a saint like Chaitanya Dev has been born in his kingdom. He is your well-wisher, he said, " and surely you will attain all round prosperity by his benediction. Why should you ask me at all for all these? Your Majesty may yourself consult your mind and know everything. You are the Lord of Navadwipa and so you have in you the same essence of the god Vishnu (who is

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্যসিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নবাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ ॥
রাজা কহে শুন মোর চিত্তে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংষয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তর।
দবীর খাস আইলা তবে আপনার ঘর ॥"

—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত (জগন্মোহন দাস ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বহরমপুর), মধ্যখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ২৮-২৯ পৃঃ।

the fountain-head of all the rulers of the Earth). Your intellect must therefore be very pure and so it must be the receptacle of all true knowledge regarding Chaitanya Dev." Then the Sultan replied, "To my mind this Chaitanya is no doubt the God himself personified." After declaring his opinion about Chaitanya Dev in these terms, the Sultan entered his harem, when Davir Khas also left the chamber for his own quarters.

—Chaitanya Charitāmrita by Krishnadas Kaviraj, Vol. I, Madhya Khanda, Chapter I, pp. 28-29.

(b) Is he (Chaitanya Dev) not a Brahman who looks like Brahmā himself in glow? Why does he cry embracing a Sudra?

(c) In the morning Chaitanya bathed in the river. Thinking that it was time to leave Brindaban he fell in a trance and lost all consciousness of the outside world. Bhattacharyya (Bāsudev Sār-

---

(*b*) "এই না ব্রাহ্মণ তেজে দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥"
—চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

(*c*) "প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্যবিচার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥
এত বলি প্রভুকে নৌকায় বসাইঞা।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর পথে যাইতে বিজ্ঞ দুইজন॥

babhaum) proposed to the Lord to visit the Mahābana forest. He then took Chaitanya Dev on a boat, crossed the river and reached the other side. They took with them Krishnadas and the Brahmān (their former acquintance) as guides who knew the locality well. On the way they (six in all) sat under a tree feeling very tired. Near the tree the cows were grazing in great numbers. The Lord saw them and his heart leapt with joy. All on a sudden a cowherd blew a flute. As soon as it reached the ears of the Lord, the sublime love overpowered him and he fell on the ground senseless. Foams were coming out of the mouth and respirations came to a standstill. Just at that time ten Mahomedan horsemen came up to that place at a gallop and alighted from their steeds. Seeing the Lord in a trance they thought that perhaps the 'Yati' (ascetic) had gold

---

যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সদা লঞা।
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিঞা॥
সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বাঁশী বাজাইল।
শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হৈঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা!
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিলা॥
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥

with him and these five fellows coveting it used 'Dātura' to kill him and thereby to decamp with the gold. No sooner had this occurred in their mind than the Pathans arrested the five companions of the Lord and threatened to kill them one and all.

Among the five, the Rajput Krisnadas was very brave. That Brahman too was very brave and got a very sharp tongue. The latter said, "O Pathans, I call you in the name of your Badshah (Emperor) to take us to the Sikdar (local military officer). This 'Yati' is my preceptor and I am a Brahman of Mathura. In the court of the Emperor I have got sufficient friends to support my cause. This Yati has got a disease for which he often falls senseless. He will recover his senses just now. If you wait here for a short time after tying us down, you will find the Sannyasi coming

---

এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইঞা।
মারি ভাবিয়াছে যতির সব ধন লঞা॥
তবে পাঠান সেই পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁদিতে লাগিল॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় সে মুখে বড় দঢ়॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাতিসার দোহাই।
চল তুমি আমি শিকদার পাশ যাই॥
এই যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাতসার আগে আমার আছে শত জন॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহিঁ চেতন পাবে হইয়া সম্বিৎ॥

round again. First ask him about the state of affairs and then kill me if you please." The Pathans replied, "We believe you two to be up-country Sadhus; but we suspect the three Bengalees who are trembling, to be robbers." Krishnadas said, "I live in the neighbouring village where I have got a company of cavalry numbering two hundred horsemen and an artillery composed of a hundred cannons. They will instantly come up here if I give the necessary signal. They will kill you all and take away (pillage) both the horses and the saddles. The Bengalees are not robbers—it is you who are so. You like to fleece the innocent pilgrims and kill them." Hearing this, the Pathans got afraid. Just then the Lord recovered, raised up his arms and began to dance in ecstasy shouting all the time the name of Hari. On witnessing such a scene the

---

ক্ষণিক ইহাঁ বৈশ বান্ধি রাখ ই সবারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তুমি মারহ আমারে॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন॥
কৃষ্ণদাস কহে মোর ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুরকী আছে শতেক কামানে॥
এখনি আসিব সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়াপিড়া লবে লুটি তোমা সবা মারি॥
গৌড়ীয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনি পাঠানের মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥

Mahomedans became alarmed, and freed the five companions of the Lord. They did it with such a haste that the Lord could not even see his companions' sad plight. Bhattacharyya caught the Lord in his arms and made him sit down. Then the Lord found time to see the Mahomedan cavalry-men before him and came to his senses. They bowed to him from a distance and pointed out to him his five companions whom they described as the thugs. They said, "These five conspired to drug you with 'Dāturā' and rob you of your gold." The Lord said, "They are not thugs as you imagine but my companions. I am only a beggar—a Sannyasi—who does not possess any wealth whatsoever. I often suffer from epileptic fits and these five are

হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি।
প্রেমাবশে নৃত্য করে উর্দ্ধ বাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যদি করয়ে চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি ধরি প্রভু বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ আগে দেখি প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি দূরে বন্দিল চরণ;
প্রভু আগে কহে এই ঠগ পঞ্চজন॥
এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতূরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমা পাগল করিয়া॥
প্রভু কহে ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥

kind enough to nurse me then." Among the Mahomedans there was one, who looked very grave. He wore a black dress resembling that of a 'pir' or Mahomedan saint. His mind yearned to have a theological conversation with our Lord. Consequently a discussion arose in which the Mahomedan was completely defeated by the Lord. The Mahomedan was struck dumb at his argument and admitted his defeat. * * * He admitted the principle of a personal God, described our Lord as God personified and agreed to all the points of Vaisnava theology. He said, "My tongue utters the name of Krishna on seeing you. My vanity as a learned man leaves me. Now do please give me instructions on Vaisnava theology." Saying this,

---

মৃগী ব্যাধিতে মুঞি কভু হই অচেতন।
এই পঞ্চ দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালা বস্ত্র পরে তারে লোকে কহে পীর॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
অরি শাস্ত্র যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥
সেই যাহা কহে প্রভু সকল খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥

ম্লেচ্ছ কহে যে কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লৈতে না পারয়

the man fell prostrate at the feet of Chaitanya Dev who said, "Get up. As you utter the name of Krisna you are now purged of the sin committed not only in this life but also in a crore of previous lives." At the bidding of the Lord, all of them uttered the name of Krishna in ecstasy. The Lord henceforth named him Ramdas. The name of another Pathan was *Bijuli Khan*. He was young in age and a prince by birth. Ramdas and other Pathans were his servants. Bijuli Khan fell at the feet of our Lord and uttered the name of Krishna. The Lord favoured him by putting his holy feet on his head. After thus favouring the Pathans, the Lord left the place. Henceforth these Pathan became Vaisnava devo-

নির্ব্বিশেষ গোসাঞিঃ লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কারো নাহি জ্ঞান॥
সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিল মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর লয় কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি কহ মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে সেই প্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে উঠে কৃষ্ণ নাম তুমি লৈলা।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলা॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥

tees and went by the name of *Pathan Vaisnavas*. They used to sing about the achievements of the Lord Chaitanya from place to place. Bijuli Khan became in time a great saint and very famous in all the holy places. Thus worked the Lord in the up-country where he showed favour even to the Mahomedans.

—Krishnadas Kaviraj's Chaitanya Charitamrita (Berhampore ed.), Madhya Khanda, pp. 736-743.

রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠানের নাম বিজুলি খান॥
অল্প বয়স তেঁহো রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্ব তীর্থে হৈল তার পরম মহত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥"

—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (বহরমপুর সং), মধ্যখণ্ড, ১৮শ অধ্যায়, ৭৩৬-৭৪৩ পৃঃ।

Narahari Chakravarti (16th-17th Century):

(23) Who can exhaust by telling the extent of mischief committed by the people' (of Navadwip)? In almost every house there could be found blood of goats, sheep and buffaloes freely flowing (being sacrificed to some gods or goddesses). Some even grasp the severed head of man in one hand and a heavy sword in another, and dance tipsily. If anybody crossed their path at that time, it would be all over with him, even if he be a Brahman. All of them (not excepting women) were corrupt and transgressed the sanctity of caste rules. They did never take their meals without meat and wine.[1] —Narottam-Vilāsa, the Seventh Vilāsa.

Govinda Das (flourished 16th Century):

(24) When the Lord Chaitanya goes on his round with his "Sankirtan" party (in Puri, the capital of Orissa) the king Pratap-Rudra follows

---

[1] "করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয় নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মত্ত মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"

—নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস,
সপ্তম বিলাস।

him running in tattered clothes (by way of humility).'[1]

—Kaḍchā by Govinda Das.

Brindabandas (born 1507 A.D.):[2]

(25) (a) Although Brahmans by caste yet Jagai and Madhai took such prohibited food as wine and beef. They always committed robbery, theft and incendiarism.

—Chaitanya Bhagavata.

(b) He was that very Hussain Shah who destroyed so many images and temples in Orissa.

—Chaitanya Bhagavata, Last part.

Kasiram Das (flourished 16th-17th century):

(26) (a) The country (Pargannah) of Indrani is a very old place. Here, by the side of the Bhagirathi stand twelve holy places. I was born in a

[1] "নগর কীর্ত্তনে যবে মহাপ্রভু যায়।
দীনবেশে মহারাজ পেছু পেছু ধায়॥"

—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

[2] (*a*) "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ!
ডাকাচুরি পরগৃহ দাহ অনুক্ষণ॥"

—চৈতন্য-ভাগবত।

(*b*) "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত খণ্ড।

Kayastha family of the village Singi. I give my genealogy as follows:—[1]

Priyankar was the forefather of our family. His son was named Sudhakar. His son was Kamalakanta. Kamalakanta's eldest son was named Krishnadas. I am younger than Krishnadas and elder than Gadadhar. I describe the above in 'Panchali' metre and hope that I may be the bee in the lotus feet of Sree Krishna.

—Kasiram Das's Mahābhārata,
'Swargārohan Parba, p. 1190.

(b) The village of Hariharpur is an excellent place in every sense of the term. In it lives Abhiram Mukhopadhyay (*lit.* Mukhati) son of Purushottam Mukhopadhyay. Kasiram composes the Mahābhārata at his directions. Let my mind always remain faithful to the feet of the Brahmans.[2]

—*Ibid.*, "Udyoga Parba," p. 675.

---

[1] (*a*) "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ, গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণ পদে মনে অভিলাষ॥"

—কাশীরাম দাসের মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ১১৯০ পৃঃ।

[2] (*b*) "হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটি অভিরাম॥

Nityananda Das (composed in the early part of the 17th century)[1]:

(27) Formerly these fellows were in the employ of *Chand Ray* as soldiers, when the committed many robberies. They were kith and kin of Chand Ray and therefore fought the Mussulmans bravely, ultimately defeating them. These myrmidons of Chand Ray pillaged many a land and increased the territorial boundary of their master. The Mahomedan Lord of Gauṛa could not dare to meet them in the field, such was their prowess ....Fully appreciating the influence of Narottam Das, they gave up their predatory habits and one and all became his disciples.

—The Prem-Vilāsa by Nityananda Das, 19th Vilāsa.

কাশীদাস বিরচিল তার আশীর্ব্বাদে।
সদাচিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে॥"
—কাশীরামদাসের মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৬৭৫ পৃঃ।

"পূর্ব্বে তারা চাঁদ রায়ের সৈন্য যে আছিলা।
চাঁদ রায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈলা॥
চাঁদ রায়ের আত্মীয় বান্ধব এরা হয়।
যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥
নানা দেশ লুটে রাজ্য করয়ে বিস্তার।
ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার॥
*　　*　　*　　*
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তার মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব ধর্ম্ম॥"
—নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস।

Alaol (composed in 1618 A.D.):

(28) "Daulat Kazi wrote 'Chandrāni' by order of the Vizier Laskar Asraf. So do you compose 'Padmāvatī' by my (Magan Thakur's) command." I listened to him with much respect and in accordance with his order, I promised to write the work.[1]

—Alaol's Padmāvatī, p. 15.

Ketakādas Kshemānanda (probably composed in 1650 A.D.):

(29) I am relating below how in the past the goddess Durgā granted me a boon in conjunction with the goddess Manasā.

I live in the taluk of one Balibhadra the son of Chandrahas. Balibhadra died leaving three minor sons—the heirs of his property. One Askarna Ray who was very valiant in war was beloved of Balibhadra like a son. The property was managed after the death of Balibhadra by one Prasad who was the 'Guru' of the three children of Balibhadra and lived in the same taluq. The place became so thinly populated that

"যে হেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল।
লস্কর উজির আসরাফ্ আজ্ঞা দিল॥
তেন পদ্মাবতি রচো মোর আজ্ঞা ধরি।
হেন কথা শুনিতে মনে বহু শ্রধা করি॥
তাহান আদেশ মাল্য ধরিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈল আমি রচিতে পুস্তক॥"

—পদ্মাবতী (আলাওল), ১৫ পৃঃ

there was hardly anybody to carry on cultivation. The village of Kanthra became so deserted that it reminded one of the nether world.[1]

When *Barakhan* fell in battle, many left the place in distress, and many began seriously to consider the situation. They thought of temporarily leaving the place to save themselves. Askarna Ray supported this view and advised the people to leave the place. Listening to his advice many left the village. It was a great misfortune for the people of the locality. I was in much embarrassment as to what to do. It was afternoon. I started with

---

[1] সুন ভাই পূর্ব্বকথা, দেবী হৈলা বরদাতা.
সহায় পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাঁহার তালুকে ঘর করি॥
তাঁহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায়, পুত্রের অধিক তায়,
রণে বনে বিজয়ী তাঁহার॥
তিন পুত্র অল্প বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয়,
তালুকের করে লেখাপড়া।
তাঁহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাই চাষ চসে,
শমন নগর হৈল কাঁথড়া॥
রণে পড়ে বারাখাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলে তবে ভাল জান॥

my brother Abhiram for the fields. Evening was gradually setting in. To the north of the village there were some marshy lands where we went to collect straw. I saw there five boys—all in mud, drawing out water with small earthen pots and catching fish. I was much amused at this scene and met them.........

—Ketakādas Kshemānanda's Manasāmangal,
Poet's Autobiography.

Krishnaram (composed in 1687 A.D.):

(30) I have seen Rāṛha, Vanga, Kalinga and Nepal. I also have seen Gaya, Prayag, Nishād and Kāpāl. Likewise I have visited one by one many

শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রাএ অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি স্নুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা যাই॥
তথায় ছাওল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।
আমার কৌতুক বড়, ছাওয়াল পাঁচেতে জড়,
সেইখানে হইলাম উপনীত॥

—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল
(কবির আত্মচরিত)।

lands and have seen the worship of the Devi (Durga) done with great ceremony. I have seen also Saptagram which has no rival on earth. The place is so thickly populated, that by the side of the Bhagirathi, huts of the people practically touch one another.[1]

—Krishnaram's Poem on Sasthi Devi
(dated 1687 A.D.)

Daulat Vizier Bahram (date ?)—

[2](31) (a) There was a famous ruler named Hussain Shah. His bejewelled throne adorned Gauṛa.

(b) Asauddin Shah is like a 'Kalpataru'

[1] রাঢ় বঙ্গ দেখিলাম কলিঙ্গ নেপাল।
গয়া পইরাগ দেখিলাম নিষাদ কাঁপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিনু দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ॥
সপ্তগ্রাম দেখিলাম নাহি তার তুল।
চালে চালে ঠেকে লোক ভাগিরথী কুল॥
—ষষ্ঠীদেবী (কৃষ্ণরাম), সন ১৬৮৭ খৃঃ অব্দ।

[2] (*a*) সর্ব্বলোক নরপতি, ভুবন বিখ্যাত অতি,
আছিল হোছন সাহা বর।
তান রত্ন সিংহাসন, অতি মায়া বিলক্ষণ
গৌড়েতে শোভিত মনোহর॥

(*b*) আছাওদ্দিন সাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম॥
—দৌলত উজির বহরামের লায়লি-মজনু—মুন্সী আব্দুল করিমের বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ হইতে, ১৫-১৬ পৃঃ।

(tree of desire). Daulat Vizier (the poet) says this in his excellent work.

—Lāyali-Majnu by Daulat Vizier Bahram (from Abdul Karim's collection of Old Bengali MSS., pp. 15-16).

Matiulla (date?)—

(32) Says the humble poet Matiulla, "He, who lives in this world without a friend is without any supporter whatever. I have fortunately got one friend myself—he is my patron Sheikh Khan Mohammad. Bowing to his feet with respect, I tell other people this interesting story. If there be any error in thought, style and metre, I think my indulgent and wise listeners would kindly excuse them and correct them themselves."[1]

—From Munshi Abdul Karim's collection of Old Bengali MSS., p. 13 ("Rasaranger Bāramash").

---

[1] কহে মতিওল্লা হীনে, যে রহিল বন্ধু বিনে,
সে হইল দু'কুল অনাথিনী ॥
সেখ খান মোহম্মদ, প্রণামি তাহার পদ,
আন সুতে কহে রসবাণী ।
অর্থভার রস ছন্দ, যদি হয় ভাল মন্দ,
বিচারে শোধিও দোষ জ্ঞানী ॥

—রসরঙ্গের বারমাস । (মুন্সি আব্দুল করিমের বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ হইতে) ১৩ পৃঃ ।

Rameswar (probably composed in 1750 A.D.):

(33) Yasomanta is the receptacle of all virtues. I, Rameswar, is his client and live under his patronage. I have composed Siva-Sankirtan.[1]

—Siva-Sankirtan by Rameswar.

Anantaram—(somewhere between the middle of the 18th Century).

(34) On remembering the dust of Bisārada's feet, I finish the first chapter in verse.[2]

—Anantaram's Kriyāyogasār MS.

---

1 যশোমন্ত,
সবগুণবন্ত,
তস্য পোষ্য রামেশ্বর,
তদাশ্রয়ে করি ঘর ;—
বিরচিল শিব-সংকীর্ত্তন ।

— রামেশ্বরের শিব-সংকীর্ত্তন ।

2 বিশারদপদে সেই রেণু অভিপ্রায় ।
পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায় ॥

—অনন্তরামকৃত ক্রিয়াযোগসার,
হস্তলিখিত পুথি ।

INFLUENCE OF PERSIAN ON BENGALI[1]

The present Bengali literature has grown out of many factors—partly racial[2] and partly religious. The Pamirians, the Austrics, the Dravidians, the Mongolians and the Aryans are the racial factors that primarily contributed to its development; the Hindu (Paurānic and Tāntric) and the Buddhist (Mahāyānī Tāntric) religions also played their important part. The indigenous (Deśī) and Prakrit dialects from various non-Aryan and Aryan sources, Sanskrit (later) from the Paurānic Aryans and Pali idioms from the Middle Country enriched Bengali literature to a considerable extent. It may be said that the structure of this language at the bottom is to some extent Austric in character, the words in everyday use as also of religion being associated with various exotic cults, later on transformed and unified due to various racial, social and religious upheavals. The greatest metamorphosis in Bengali language was brought about by the Aryans whose advent in Bengal and dissemination of Paurānic ideas through the very rich Sanskrit literature of Post-Vedic type may be assigned as the cause of it.

The origin and first stage of Bengali language cannot be dated earlier than the ninth century A.D. A new era dawned in Bengali literature from the

[1] From Indo-Iranica, June, 1948.

[2] "Pre-Historic, ancient and Hindu India" by R. D. Banerjee, and "PreAryan and Pre-Dravidian in India" by Sylvain Lévi, Jean Pryzluski and Jules Bloch (Eng. transl. by P. C. Bagchi), and "The Presidential Address" (Sociology branch, Prabāsi-Vaṅga Sāhitya Sammelan), 29th Dec. 1938, by S. C. Roy.

appearance of the Muslims in Bengal at the end of the twelfth century. Owing to the partial military conquest of Bengal by the so-called Pathans at the end of the twelfth century, the people of Bengal witnessed a new transformation in their society, religion and language. These Pathans or Afghans of Afghanistan were really Persians. Though these newcomers were at first not too numerous, their number was gradually inflated by proselytization from among the rank and file of the Hindu community. The period of their rule in Bengal, which they also made their home, comprised no less than three centuries (i.e., from the thirteenth to the fifteenth century) after which it was subverted by the rule of the so-called Mughals who were no other than the Central Asian Turks. It may be remarked that both the Pathans and the Mughals (who ruled Bengal up to the middle or end of the eighteenth century) were deeply imbued with the ideals, culture and social etiquette of the Persians, though in religion the former were Sunnīs and the latter Shi'as.

During the Muslim rule in Bengal the difference in race and religion between the rulers and the ruled made the administration at first very irksome, but, in course of time, better understanding prevailed and the people of both the faiths lived side by side in harmony and as good neighbours. Although the Pathan Sultans ruled Bengal at first as aliens and in militant spirit, gradually they became friendly with the Hindu people of the land and some of them became great patrons of Bengali literature which was mostly religious. Two illustrious names may be mentioned, and they are Sultan Husayn

Shah and his son Sultan Nusrat Shah (fifteenth to sixteenth century).

With the Muslim rule in Bengal, Persian influence began to be appreciably felt in Hindu society and Bengali language as well. The influence seemed to be more cultural than religious, though in part it necessarily passed through religion. The Persian (and generally Islamic) influence in Bengal were twofold in character, viz., (1) in religious matters, (2) in the field of language and literature. The first was reciprocal, while the second was only in connection with the influence of Persian on Bengali language and literature.

Reciprocity was so much felt in the field of religion that very soon a mixed god was evolved having the qualities of both the religions. The god was named Satya-pīr, similar to the Hindu god Satya-Nārāyan; the name itself combining elements of both the faiths. This god also found a place in Bengali literature and the poems composed in his honour contained an appreciable number of Persian words. Not only the Muslims freely mixed with the Hindus; some of them also occasionally worshipped the Hindu deities. The names of a Zaminder Gharib Husayn Chowdhury of Dacca (nineteenth century), Shamsher Ghāzī, Chief of Tipperah (eighteenth century), Yavan Harīdās sixteenth century) and Bijali Khān, the Pathan Military Officer (sixteenth century), are cases in point, as mentioned in Bengali literature. A class of Muslims still sing songs in praise of the Hindu goddess Lakṣmī (the goddess of Luck). Many Muslim poets composed devotional songs in the names of Rādhā-Kṛṣṇa and the goddess Kālī and

also wrote highly specialized books on the Yoga system of philosophy. The laudatory Sanskrit verses in the name of the goddess Gaṅgā (the Ganges) as composed by one Muslim named Dārāb Khān (eighteenth century) has been incorporated in the religious manual of the Hindus. In the field of Bengali literature no name was so illustrious among Muslims as that of Alaol, the poet of the Padmāvatī (seventeenth century), the book being originally composed in Hindi by Malik Md. Jāyasī. Alaol made a free translation of the Hindi poem in Bengali verses, showing his originality in many places. The wealth of Sanskrit learning as displayed in the book of Alaol is simply astounding and it outdid many prominent Hindu writers in the field of Sanskrit scholarship.[1]

As regards the Hindus, they have shown every respect for the Muslim Pīrs (saints), Faqīrs and Darvīshes (religious mendicants). They would visit Dargahs (tombs and shrines of Muslim pious men) for various reasons of domestic felicity and utter the names of Pīrs and Ghazīs in deep veneration when in distress, either on land or in water. The Hindus would utter the sacred verses from Al-Qur'ān and the Muslims would utter the names of Hindu Seven Sages when out on a difficult journey. In the Manasā-Maṅgal of Ketakādas-Ksemānanda the hero Lakṣmīndra is said to have kept the Qur'ān with him in his strong-room among other safeguards against snake-bite. On social and religious occasions members of both the communities would join hands with each other unreservedly.

---

[1] *History of Bengali Language and Literature* and *Vaṅga-bhāṣā-o-Sāhitya* by D. C. Sen.

Many Persian words crept into Bengali language[1] (1) due to the political administration being Muslim; and (2) due to the two communities living side by side as good neighbours. The principal Islamic language that entered into Bengali language and enriched it was, no doubt, Persian, as whether the Pathan or Mughal governor, they freely imitated Persian manners and introduced Persian as the Court-language, thereby making the subject nations accustomed to it. In spite of the fact, that, some Arabic words also found its way into Bengali, it is curious to note the Arabs once conquered Persia but succumbed to the better culture of the Persians. Henceforth, not only the Arabs but also the Turks, Afghans and Muslims, all and sundry, belonging to the neighbouring countries, competed with one another in their imitation of the Persian manners, language and ways of life. The conquest of Greece by the Romans may be cited as a parallel case. Similarly Islam conquered Bengal militarily but allowed itself to be conquered culturally, to some extent, by the Hindus of Bengal. This is due, firstly because a part of the Muslim population in Bengal were converted Hindus and secondly because due to inter-marriages (forced or otherwise) between the two communities and consequent limited good understanding, an atmosphere of 'give and take' gradually arose between the two.

Many Muslim writers and poets enriched the Bengali language by their contribution of Persian words. The Hindu writers and poets using Persian are also numerous enough to allow mention here.

[1] S. K. Chatterji, *Origin and Devslopment of Bengali Language.*

However, a few specimens are given below (from old Bengali literature) by way of giving an idea of the use of Persian. Roman characters here used are only for the convenience of non-Bengali readers.

(1) The following are a few lines from a poetical and religious work called *Śūnya Purāṇ* (eleventh century A.D.), that may have been later interpolations. The sense here is that the deity Dharma and the attendant Hindu gods assumed the guise of the Prophet and other saints of Islam to punish the orthodox Brāhmans of Yājpur (in Orissa) for oppressing the followers of Dharma. Thus we read:

"ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হৈয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিলা ইজার॥

ব্রহ্মা হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকম্বর
আদম্ফ হৈলা শূলপাণি।
গণেশ হৈলা গাজী কার্ত্তিক হৈলা কাজি
ফকির হৈলা জত মুনি॥

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হৈলা সেক
পুরন্দর হৈলা মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হৈয়্যা সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা॥" ইত্যাদি।

—শূন্য-পুরাণ, রামাই পণ্ডিত।
(শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা)

'Dharma hailyā yavan-rūpī, Māthāeta kālaṭupī,
hāte sobhe trirūc Kāmān I
Cāpiyā uttam hay, tribhubane lāge bhay,
Khodāy baliyā ek nām ||

Nirañjan nirākār hailā Bhesta abatār,
mukhete baleta Daṃbadār I
yatek devatāgan, sabhe haiyā ekman,
ānandete parilā ijār ||

Brahmā hailā Mahammad, Viṣṇu hailā Pekāmbar,
Ādampha hailā Śūlapāṇi I
Gaṇesh hailā Gāji, Kārtik hailā Kāji,
Phakir hailā yata Muni ||

Tejiyā āpan bhek, Nārad hailā Sek,
Purandar hailā Malanā I
Candra Sūryya ādi deve, padātik haiyā seve,
save mili bājāy bājanā ' ||

—*Śūnya-Purāṇa*, by Rāmāi Pandit.

(2) Kavikaṅkaṇ Mukundarām (a famous poet of the sixteenth century) appreciably used

Persian words in his religious poem on goddess Caṇḍī, the following lines being taken from his work. It is in connection with the advent of various classes of Muslims into the city of Gujrat said to be built by the fabulous hero Kālaketu. King Kālaketu allotted to them the western part of his city for settlement following the time-honoured custom:

"আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বোলায় হাসন হাটী,
এক সমুদায় গৃহ বাড়ী॥

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥

দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥

বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥" ইত্যাদি।

—চণ্ডীমঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

'Āise caṛiyā tāji, Saiyyad Mog̓al Kāji,
Khayrāte vīr dey bāṛi ।
purer paścim paṭī, bolay Hāsan hāṭī,
ek samudāy gṛha bāṛi ॥

Fajar samaye uṭhi, bichāyyā lohit pāṭī,
pānc beri Karaye namāj ।
Chilimili mālā dhare, jape pīr pegambare,
pīrer mokāme dei sānj ॥

Daś biś berādare, basiyā vicār kare,
anudin Kitāb Korāṇ ।
Sānje ḍālā dei hāṭe, pīrer sīrini bānte
Sānjhe bāje dagaṛ niśān ॥

Baṛai dānisbanda, Kāhāke nā kare chanda,
prāṇ gele rojā nāhi chāṛi ।
dharaye Kāmboj veś, māthe nāhi rākhe keś,
buke ācchādiyā rākhe dāṛi' ॥

—*Caṇḍīmaṅgal*,
by Kavikaṅkaṇ Mukundarām.

Among the Hindu poets of celebrity, there were two, *viz.*, Mukundarām (sixteenth century) and Bhārat Candra (eighteenth century) who used Persian unreservedly in some portions of their writings, *viz.*, *Caṇḍīmaṅgal* and *Annadā-Maṅgal*. Bhārat Candra (the poet of the *Annadā-Maṅgal*) went a step further. He wanted to devise a mixed language (as wanted by Rājā Mānsingh and Emperor Akbar according to his version). In this language Urdu, Persian, Sanskrit and true Bengali words were freely used. His *Caṇḍī-nāṭak* (a drama on the goddess Caṇḍi), contains the specimens of

his labours to build up a 'lingua franca'. Unfortunately the book is found incomplete and shows his unsuccessful, though laudable, attempt in this direction. The poet had died before it was completely finished.

(3) The specimen of a court-document (seventeenth century) containing Persian words are given below. These documents are still written in the same way and include a mixed language of Sanskrit, Persian, Urdu and Bengali. The following document contains a complaint to the Court for realization of money given on loan to a party:

"আরজি শ্রীরামকান্ত চন্দ্র সাং বিষ্ণুপুর—

আসামী শ্রীসদারাম মহান্ত চকলা তথা সাং ইন্দাষ মকদ্দমা ইহার স্থানে আমার এক কিত্যা তমস্থ দিয়া টং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা আর চটা বাবুদ্ ৫০৲ পঞ্চাশ তঙ্কা একুনে ৫৫০৲ পাঁচ শত পঞ্চাশ তঙ্কা সররতি করি দেয় না একারণে নালিশ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার হক আদালত করিয়া আসামী আদালতকে হুকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়া দিয়াতে হুকুম হইবেক আমি গরিব সাহেব ধর্ম্ম-অবতার আমার পানে নেক-নজর করিয়া দেলাইয়া দিআইবেন এই আরজ নিবেদন করিলাম সন ১০৯৬ সালে তাং ২২ আষাঢ়।"

—আদালতের আরজি।

(বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন)।

'Ārji Śrī Rāmkānta Candra, sāṁ Viṣṇupur—

Āsāmī Śrī Sadārām Mahānta caklā tathā sāṁ Indāṣ makaddamā ihār sthāne āmār ek kityā tama-

su diyā ṭaṁ 500/- pāñc śata ṭākā ār caṭā bābud pañcāś taṅkā (Rs. 50/-) ekune pāñcśata pañcās taṅkā (Rs. 550/-) Sararati kari dey nā e kāraṇe nāliś Sāheb Dharma-abatār hak ādālat kariyā āsāmi ādālatke hukum kariyā āmār ṭākā delāiyā diyāte hukum haibek āmi garib Sāheb Dharma-abatār āmār pāne nek-najar kariyā delāiyā diāiben ei āraj nibedan karilām San 1096 sāle tāṁ 22 Aṣāṛh'.

—*Vaṅga-sāhitya Paricaya*,
Vol. 2, by D. C. Sen.

(4) In A.D. 1801 Rāmrām Basu wrote his famous Life of Rājā Pratāpāditya of Jessore called *Rājā Pratāpāditya Caritra* using Persian words profusely. We cite below a passage in connection with the Emperor Humayun of Delhi and Nawab Sulaiman of Bengal:

"যে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্থানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহাদের আপনার মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝগড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিৎ ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না।"

—প্রতাপাদিত্য-চরিত্র, রামরাম বসু।

'Ye Kāle Dillir takte Homāṅu Bādsāha takhan Cholemān Chilen kebal Banga-o-Behārer Nabāb pare Homāṅu Bādsāher ophāt haile Hen-

dosthāne Bādsāha haite byāj haila e Kāraṇ Homāṅu Chilen bṛhat goṣṭhī anekgulin santān tāhārder āpanār madhye ātṃa-kalaha haiyā bistar bistar jhakṛā laṛāi Kājiyā upasthit chila ihāte subājāter tahaśil tāgādā kichu haiyāchila nā.'

—*Pratāpāditya Caritra,* by Ramram Basu.

Among the Muslim story-writers, the following names are only taken from among many, deserving special mention. Their writings contained a very large number of Persian and Urdu words, for which the style of writing adopted by them was known as Musalmāni Bānglā ('Muslim style of Bengali writing'):

Books	Authors
Candrābalir Puñthi	Munshi Md. Abed.
Madhumālār Kecchā	Khundakar Abed Ali.
Mālañca Kanyār Kecchā	Munshi Ijazuddin.
Jvarāsurār Puñthi	Munshi Enayatullah Sarkar
Sati Bibir Kecchā	Munshi Ijazuddin.
Mālati Kusum-mālā	Muhammad Munshi.
Kāncanmalar Kecchā	Munshi Muhammad.
Sakhi-Soṇā	Md. Qorban Ali.
Yāmini Bhān	Md. Khater.
Indra-sabhā	Munshi Amanat.
Śit-Vasanter Puñthi	Munshi Gholam Qader.
Sāper Mantra	Mir Khurram Ali.
Bheluā Sundari	Hamidullah.
Yamil Dilārām	Aftabuddin.
Lor Candrāni	Daulat Qazi.
Layli Majnu	Daulat Vazir Bahram.
Yāmini Bahāl	Karimulla.

Among the *Vidyā-Sundar* class of poems, so well-known in Bengali literature, one at least was

written entirely in Persian, and that long before Bhārat Candra wrote his celebrated poem.

A particular kind of philosophical outlook of life took its shape in Bengal as early as the eighth century A.D. as a legacy of the days of the *Upaniṣads*. Śaṅkarāchāryya, the great Śaiva ṣaint, gave an impetus to the thought already in the air. This particular outlook of life relates to the mutability of everything worldly, and it bcame very popular, specially in Bengal, from the fifteenth century onward. With a class of Vaiṣṇava religious mendicants known as the Bāuls, the idea is a special favourite, and their songs are always surcharged with it. Some think that this peculiar idea had its origin among the Sufīs of Persia. The philosophy of 'Umar Khayyām (of that country) has also some affinity with it. But for want of definite evidence, we regret, we are unable to endorse this view. If Elphinstone is to be believed, he recorded in his *History of India,* the incident of an Indian Gymnosophist whom Alexander the Great met in Persia. The philosophy of life of this Gymnosophist was very similar to the thought mentioned above. However, as much can be said on both sides, we leave the question open.

So far as Bengali language is concerned, many foreign words from Arabic, Persian, Portuguese, French and English have found their places in it, but if we leave aside English, no other language than Persian has enriched it more completely or extensively.

The End

INDEX

C.

D.

S.

T.

U.

V.

W.

Y.